কাশ্মিরের অসম সাহসিনী নারী মুক্তিযোদ্ধা
ফরীদা আপার ঈমান-আলোকিত কাহিনী

কাশ্মির বীরাঙ্গনা

শাওকিন কাশ্মিরি

কাশ্মির বীরাঙ্গনা

গ্রন্থনা

সাংবাদিক শাওকিন কাশ্মিরি

মাসিক বেদার ডাইজেস্ট-এর সৌজন্যে
মাসিক রহমতে প্রকাশিত

আবাবীল পাবলিকেশন্স
১৩, কারকুন বাড়ি লেন, ঢাকা- ১১০০

প্রকাশক
আব্দুল করীম
১৩, কারকুন বাড়ি লেন, ঢাকা- ১১০০

প্রথম প্রকাশ
জুন ২০১৪

প্রচ্ছদ
নাজমুল হায়দার

বর্ণ বিন্যাস
এম. হক কম্পিউটার্স

মূল্য : একশত বিশ টাকা

সূচি

কাশ্মির বীরাঙ্গনা

পরিচিতি

ফরীদা আপা। কাশ্মিরের শহীদ মোহাম্মদ ইউসুফ বেগ-এর জ্যেষ্ঠা কন্যা। মোহাম্মদ ইউসুফ বেগ শ্রীনগরের আলুচাবাগের এক গরিব পরিবারের সন্তান। শহীদ ইউসুফ বেগ-এর বড় ভাই হাবীবুল্লাহ বেগ ভারত বিভক্তির পর-পর কাশ্মির ত্যাগ করে পাকিস্তান চলে যান এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। রাওয়ালপিণ্ডির স্যাটেলাইট টাউনে তার বাড়ি। পঞ্চাশ বছরে বছর বিশেক আগে ইউসুফ বেগ মাত্র একবার বড় ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে পাকিস্তান গিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, এমন মুহূর্তে জালেম ভারতীয় বাহিনী তাঁকে গ্রেফতার করে তাদের নিরাপত্তা হেফাযতে নির্মমভাবে হত্যা করে।

শহীদ মোহাম্মদ ইউসুফ বেগ-এর প্রায় পুরোটা জীবনই কেটেছে নেহায়েত দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে। বিয়ে করেছিলেন অতি অল্প বয়সে। শ্রীনগরের বার্বার শাহ এলাকায় রজব ভাটের কন্যা সাঈদা বেগম তার স্ত্রী। ইউসুফ বেগ ও সাঈদা বেগমের দাম্পত্যজীবন অতি কষ্ট ও সংকটের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। আর্থিক সংকট তাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গের রূপ ধারণ করে। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ইউসুফ বেগ যা উপার্জন করতেন, তা দিয়ে কোনো রকমে চারটা ডাল-ভাতের ব্যবস্থা হতো মাত্র।

শহীদ মোহাম্মদ ইউসুফ বেগ লেখাপড়া জানতেন না। তার বংশে না শিক্ষার কোনো পরিবেশ ছিল, না কারও শিক্ষিত হওয়ার আগ্রহ ছিল। 'মজুরের ছেলে মজুরই হবে' এ রীতিরই বাস্তবায়ন ছিল তাঁর বংশে। পিতা সন্তানদের লেখাপড়া শেখাননি; বরং অল্প বয়সেই উপার্জনের কাজে জড়িয়ে দিয়ে যান।

শহীদ মোহাম্মদ ইউসুফ বেগ অত্যন্ত কোমলস্বভাব, ধৈর্যশীল ও লাজুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। এতই ভদ্র ছিলেন যে, জীবনে কখনও কারও সঙ্গে মারপিট তো দূরে থাকুক. বাগ্বিতণ্ডাও করেননি। গোটা জীবন কেটেছে তাঁর কৌলিন্য ও সরলতার মধ্য দিয়ে। কোনো কাজে কখনও ক্লান্তি অনুভব করেননি। বড় পরিশ্রমী ও স্বল্পেতুষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। দাম্পত্য জীবনে তিনি তিন পুত্র ও দুই কন্যা সন্তানের জনক।

বিয়ের তিন বছর পর প্রথমা কন্যার জন্ম হয়। মেয়েটির নাম রাখেন ফরীদা। ফরীদা দেখতে ঠিক মায়ের মতো। প্রথম সন্তান হিসেবে ফরীদা পরম আদর-যত্নে লালিতা-পালিতা হতে থাকে। রূপ-সৌন্দর্য ও শরীর-স্বাস্থ্যের কারণে শুধু ইউসুফ বেগ-এর পরিবারেই নয় – ফরীদা গোটা এলাকার সকলেরই আদরিণী।

ফরীদার বয়স যখন আড়াই বছর, তখন ইউসুফ বেগ-এর ঘরে আগমন ঘটে ফুটফুটে এক পুত্র সন্তানের। আনন্দের বন্যা বয়ে যায় সকলের মনে। ইউসুফ বেগ পুত্রের নাম রাখেন শাকিল আহমাদ। শাকিল আহমাদের বয়স যখন আড়াই বছর, তখন জন্মলাভ করে আরেকটি কন্যাসন্তান। নাম রাখেন ডেইজি। ফরীদার মতো ডেইজিও ঠিক মায়ের অনুরূপ – দুই বোন দেখতে ঠিক একই রকম।

ডেইজির বয়স যখন প্রায় তিন বছর, তখন জন্ম হয় আরও একটি পুত্রসন্তান। নাম রাখা হয় বেলাল আহমাদ। বেলালের তিন বছর বয়সে ইউসুফ বেগ বাবা হন তৃতীয় পুত্রসন্তানের। নাম রাখেন ফিরোজ। যে-বছর ফিরোজের জন্ম হয়, ফরিদার বয়স তখন দশ বছর।

ইউসুফ বেগ যে-ভূখণ্ডের বাসিন্দা, সেখানে মেয়েদের লেখাপড়া করে শিক্ষিত হওয়ার প্রচলন নেই। তারা কন্যাসন্তানদের স্কুলে পাঠাবার কথা কল্পনাও করে না। তাই ইউসুফ বেগ-এর দুই কন্যা ফরীদা ও ডেইজি অশিক্ষিতই রয়ে যায়। তবে পুত্রের মধ্যে বেলাল ও ফিরোজ প্রাথমিক কয়েক শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করতে সক্ষম হয়।

সংসারের ঘানি টানতে ইউসুফ বেগ-এর এখন অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন। তাই বয়সে পরিণত হওয়ার আগেই তিনি একে-একে সবকটি পুত্রকে উপার্জনের জন্য কাজে জুড়িয়ে দেন।

ইউসুফ বেগ-এর ঘরে পর-পর জন্ম নিল পাঁচটি সন্তান। বিশেষত দুটি রূপসী কন্যার সঙ্গে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হাট্টা-কাট্টা সুশ্রী তিনটি পুত্রসন্তানের জন্মে তার ঘরে চোখ লেগে গেছে যেন মানুষের। সবকটি সন্তানের অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকছে এখন। পিতা দিনভর মজুরি খেটে যা উপার্জন করেন, পেটের আগুন নেভাতেই তা ব্যয় হয়ে যায়। তার উপর একের-পর-এক সন্তানদের রোগ-ব্যাধি ইউসুফ বেগকে সীমাহীন সংকটে ফেলে দেয়। ইউসুফ বেগ-এর সমস্যা ও দুশ্চিন্তা বহুগুণ বেড়ে যায়।

ইউসুফ বেগ রুটি-রুজির সন্ধানে সেই কাকডাকা ভোরে বের হন। ফেরেন সন্ধ্যার পর। রোগাক্রান্ত সন্তানদের সেবা-চিকিৎসার পুরো দায়িত্ব চাপে স্ত্রী সাঈদার উপর। সন্তানদের রোগ-ব্যাধির বাস্তব চিত্র হলো এই অধিকাংশ সময় এমন হয়েছে যে, হাসপাতালের এক ওয়ার্ডে এককন্যা চিকিৎসাধীন, তো আরেক ওয়ার্ডে একপুত্র চিকিৎসাধীন। কখনও এক বেডে এক সন্তান, পাশের বেডে অন্য সন্তান আর দুজনে মধ্যখানে মা সাঈদার দৌড়-ঝাঁপ।

১৯৭১ সাল। কাশ্মিরে তখন খাজা গোলাম মোহাম্মাদ সাদেক-এর শাসন। তখন পারশিমুরী নাম্মী এক শিক্ষিতা হিন্দু তরুণী ইসলাম গ্রহণ করে এক মুসলিম যুবকের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। মেয়েটি নিজের নাম ধারণ করে পারভিন। এর প্রতিক্রিয়া হয় ভয়াবহ। কাশ্মিরের গোটা হিন্দুসমাজ, বিশেষ করে পণ্ডিতমহল তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। ঘটনাটিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রূপ দিয়ে প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে তারা। হিন্দু-মুসলিম সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র।

শান্তি রক্ষায় প্রশাসন কয়েক দিনের জন্য কারফিউ জারি করতে বাধ্য হয়। ইউসুফ বেগ-এর দুই সন্তান শাকিল ও ডেইজি তখন হাসপাতালে। কারফিউ সাত দিন পর্যন্ত বহাল থাকে। হাসপাতালের রোগীরা পড়ে যায় মহাসংকটে। শাকিল ও ডেউজির মা কারফিউ উঠে যাওয়ার সাথে-সাথে সন্তানদের নিয়ে হাসপাতাল ছেড়ে পালিয়ে আসেন।

ফরীদার মা বলেন–

“আমি যখন মা ছিলাম, তখন আমার জীবনটা কেটেছে সন্তানদের সঙ্গে হাসপাতালে। আমার দৌড় সীমাবদ্ধ ছিল ডাক্তারের চেম্বার আর

ক্লিনিক-হাসপাতাল পর্যন্ত। আর যখন আমি দাদি হই, তখন আমার হাঁটার মোড় ফিরে যায় দেশের বিভিন্ন জেলখানার দিকে।"

ফরিদার মা সাঈদার দুই পুত্র, দুই জামাতা আর দুই নাতি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জেলে কারাভোগ করে। তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও খবরাখবর নিতে তার এক পাক থাকত যদি জম্মু, তো অপর পা থাকত দিল্লি। আজ থাকতেন যদি জুধপুর, তো কাল থাকতেন মধ্যপ্রদেশ। এভাবে তার জীবন যে-পরিমাণ দুঃখ-কষ্ট ও জুলুম-নির্যাতনের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে, তার পরিমাপ করা সম্ভব নয়। স্বামী ইউসুফ বেগকে নিরাপত্তা হেফাযতে হত্যা করে ফেলে ভারতীয় হায়েনারা!

মোহাম্মাদ ইউসুফ বেগ ও সাঈদা বেগমের দাম্পত্যজীবনের প্রথম ফসল বড় কন্যা ফরীদা – কাশ্মিরি মুসলমান ও মুজাহিদদের কাছে যিনি 'ফরীদা আপা' নামে পরিচিতি – একজন জানবাজ, নির্ভীক ও দুঃসাহসী নারী। ফরীদা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, সমঝদার ও অভিজ্ঞ মহিলা। তার বুঝ-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা এতই প্রখর যে, শুধু শিক্ষিতা মহিলারা-ই নয়, বিজ্ঞ পুরুষরাও তার থেকে পরামর্শ নিয়ে থাকেন। কোনো মূল্যবান বস্তু; যেমন পোশাক, অলংকার ইত্যাদি কিনতে হলে ফরীদার কাছে এসে ধরনা দেয় যে কেউ। কাজ-কারবার ও লেনদেনে তার মতামত না নিলে চূড়ান্তে পৌঁছতে পারে না যেন কেউ। বিবাদ-মীমাংসায় ফরীদার শরণাপন্ন হন বড়-বড় বিচক্ষণ পুরুষরাও। অনুপম এক ভাগ্যবতী ও গুণবতী নারী 'ফরীদা আপা'।

ফরীদা আপার শৈশব কেটেছে নেহায়েত দারিদ্র ও ক্লেশের মধ্য দিয়ে যেমনটা আগেই বলেছি। ষোলো বছর বয়সে শ্রীনগরের বারাবার শাহ এলাকার মোহাম্মাদ মকবুল জান নামক এক মিস্ত্রী যুবকের সঙ্গে ফরীদার বিয়ে হয়ে যায়।

ফরীদা অত্যন্ত ভাগ্যবতী মহিলা। মকবুল জান যখন ফরীদাকে বিয়ে করে ঘরে তোলে, তখন সে এক কারখানায় পাঁচশো টাকার বেতনে চাকরি করে। কিন্তু ভাগ্যবতী ফরীদা শ্বশুরালয়ে প্রবেশ করার পর অল্প ক-দিনের ব্যবধানেই মকবুল জান চাকরি ত্যাগ করে পার্টনারশীপে একটি কারখানা চালু করতে সক্ষম হয়। কিন্তু বিয়ের বয়স এক বছর পূরণ না হতেই

ফরীদা মারাত্মক এক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। চিকিৎসা শুরু হয়। কিন্তু নিরাময়ের পরিবর্তে অসুখ দিন-দিন বাড়তেই থাকে। অবশেষে একজন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ডাক্তার ফরীদার শাশুড়িকে জানান, আপনার পুত্রবধূ বন্ধ্যা। তার সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা নেই। এ রিপোর্টে ফরীদার দাম্পত্যজীবনে সাত সাগরের প্রচণ্ড ঝড় উঠে যায়।

যে-সংসারে এতদিন ফরীদার আদর-সোহাগের অভাব ছিল না, সেই সংসারে ফরীদা এখন উপেক্ষিতা ও অপয়া। ঘটনা এতদূর গড়াল যে, পিতামাতার পক্ষ থেকে মকবুল জানের উপর ফরীদাকে তালাক দেওয়ার প্রবল চাপ শুরু হয়ে গেল। দিন-দিন এই চাপ বাড়তে থাকল।

কিন্তু মকবুল জান ফরীদাকে তালাক দিতে স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকৃতি জানায়। ফলে বিষয়টি পারিবারিক কলহের রূপ ধারণ করে। মকবুল জান ফরীদাকে নিয়ে পিতামাতার সংসার থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়। ফরীদাকে নিয়ে তিনি সাময়িকের জন্য শ্বশুরালয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

এ সময়ে মকবুল জান পার্টনারশীপ থেকে বেরিয়ে এসে কারখানা নিয়ে এককভাবে ব্যবসা শুরু করে। কিছুদিনের মধ্যেই একটা বাড়িও ক্রয় করে ফেলে। এই বাড়িতে স্ত্রীকে নিয়ে মকবুল জান চার বছর বাস করে।

'কাশ্মির মোটর ড্রাইভার্স এসোসিয়েশন' বাসস্ট্যান্ডের সন্নিকটে প্রতিষ্ঠিত মকবুল জানের নিজস্ব কারখানাটি এতই লাভজনক হয়ে উঠল যে, এ কারখানায় প্রস্তুত পণ্য ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হলো। দশ বছর পর মকবুল জান ক্রয় করা বাড়িটি বিক্রি করে নটিপুরায় দেলসুজ কলোনীতে কয়েক কাঠা জমি কিনে তার উপর একটি মনোরম বাড়ি নির্মাণ করেন।

বিক্রি করা বাড়িটিতে বসবাস করা অবস্থায় পিতামাতার সঙ্গে মকবুল জানের সমঝোতা হয়ে যায়। দেলসুজ কলোনীর বাড়টি নির্মিত হওয়ার পর থেকে পিতামাতা ও ভাই-বোনরা এ বাড়িতে আসা-যাওয়া শুরু করে এবং মাসের-পর-মাস বেড়াতে থাকে।

মকবুল জান সকালে কারখানায় চলে যেত এবং ফিরে এসে সারা দিনের উপার্জন স্ত্রী ফরীদার হাতে তুলে দিত। দু-জনের দাম্পত্য ছিল

অত্যন্ত সুখময়। তারা স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে শুধু ভালই বাসত না, একজন অপরজনের আনুগত্যও করত পুরোপুরি। মকবুল জান নিজেকে সংসারের একজন উপার্জনকারী ব্যক্তি অপেক্ষা বেশি ভাবত না। কারণ, সামাজিকতা, লেনদেন, সংসারের সার্বিক তত্ত্বাবধান প্রভৃতি ফরীদাই আঞ্জাম দিত। ফরীদা যেন এ ঘরের রানি। ফরীদার বুঝ-বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা সত্যিই অনুপম। যোগ্যতাবলে সে সংসারটাকে যেন জান্নাতে পরিণত করে ফেলেছিল।

ফরীদা অত্যন্ত হৃদয়বান মানুষ। অভাবীর অভাব পূরণে কার্পণ্য করত না কখনও। তাকে আল্লাহ সব গুণই দিয়েছেন, দেননি শুধু পুঁথিগত বিদ্যা। তার আছে একটি স্বচ্ছলতু সুখময় সংসার, আছে সোহাগী স্বামী। আছে ভদ্র, সহনশীল ও বিদ্যানুরাগী সন্তান। বন্ধ্যা ফরীদা তিন পুত্রটি সন্তান ও এক কন্যা সন্তানের মা হলেন। বড় ছেলে মুদ্দাস্‌সিরের বয়স আঠারো বছর। ছোট ছেলে মুসার্‌রাতের পনেরো বছর। কন্যা সায়েমার বয়স চৌদ্দ বছর।

কাশ্মিরের আযাদি আন্দোলনের জন্য নিবেদিতা ও চরম নির্যাতিতা এক মহিলার নাম ফরীদা। জিহাদে-কাশ্মিরের এক বীর মুজাহিদার নাম ফরীদা। এই জিহাদে কিভাবে তার অংশগ্রহণ, কিভাবে তার দুঃসাহসী জিহাদের নেতৃত্বদান ও নির্যাতনবরণ, আমরা তার বিস্তারিত কাহিনী শুনব তারই জবানিতে।

শুরুর কথা

১৯৮৭ সালে ভারতের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে 'মুসলিম মুত্তাহাদা মাহায' প্রথমবারের মতো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। মুসলিম মুত্তাহাদা মাহায-এর লক্ষ্য ছিল, নির্বাচনে জয়লাভ করে আইনগতভাবে এ্যাসেম্বলির দখল হাতে নিয়ে ভারতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা। ফলে সর্বস্তরের নারী-পুরুষের সঙ্গে আমিও এই নির্বাচনি তৎপরতায় জড়িয়ে পড়ি। মুসলিম মুত্তাহাদা মাহাযকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে আমি কাশ্মিরি মহিলাদের সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করি। এই আন্দোলনে আমি মহিলাদের পাশাপাশি বেশ কজন প্রভাবশালী পুরুষকেও জড়িয়ে নিতে সক্ষম হই। আমি সর্বান্তকরণে নির্বাচনি কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

'মুসলিম মুত্তাহাদা মাহায' এমন একটি শক্তশালী রাজনৈতিক জোট, কাশ্মিরের প্রায় সবকটি বড় ইসলামি ও রাজনৈতিক দল যার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু জাতীয় নির্বাচন কমিটির প্রধান মৌলভী মোহাম্মাদ ফারুক মুসলিম মুত্তাহাদা মাহাযকে সমর্থন দেওয়ার পরিবর্তে প্রতিদ্বন্দ্বী ন্যাশনাল কনফারেন্স ও কংগ্রেসের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করে। মৌলভী ফারুক ড. ফারুককে এই শর্তে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি নির্বাচনে মুসলিম মুত্তাহাদা মাহাযকে পরাজিত করে দেবেন।

মৌলভী ফারুক ও ড. ফারুকের যোগসাজশ কাশ্মিরি মুসলমানদের জন্য বিরাট এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেয়। তারপরও কাশ্মিরি জনতা এই চ্যালেঞ্জ বরণ করে নেয়। প্রাদেশিক সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার যখন অনুভব করল, কাশ্মিরি জনতা মুসলিম মুত্তাহাদা মাহায-এর পক্ষে, তখন অতি নীরবে এক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম মুত্তাহাদা মাহায-এর বিজয়কে পরাজয়ে পরিণত করে দেয়। ড. ফারুক মৌলভী ফারুককে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করে দেখান।

সেই ঘটনাটি ছিল আমাদের জন্য চরম বেদনাদায়ক, যা আমাদের মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। আমরা মনে-প্রাণে বিদ্রোহী হয়ে উঠি। নির্বাচনের সময় মুসলিম মুত্তাহাদা মাহায-এর বেশ কজন সক্রিয় যুবক কর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে যায় এবং তাদের উপর নির্মম নির্যাতন চালায়।

'চুরি আবার সিনাজুরি'র এই পলিসি গ্রেফতারকৃত যুবকদের চরমভাবে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। পুলিশ লকাপে তারা একসঙ্গে থাকার সুযোগ পায়। এতে তারা পরস্পর মতবিনিময় ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরিকল্পনা তৈরি করারও সুযোগ পায়। কিছুদিন পর জেল থেকে বেরিয়ে এসে তারা আরও কিছু যুবকের সঙ্গে যোগাযোগ ও মতবিনিময় করে ভারতের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক সশস্ত্র আন্দোলন পরিচালনার পরিকল্পনা ঠিক করে। কিন্তু তারা তাদের সকল পরিকল্পনা গোপন রাখে।

পরিকল্পনা মোতাবেক যুবকদের একটি দল সীমান্তের ওপারে (আযাদ কাশ্মির) চলে যায়। প্রথম প্রথম কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলেও তারা সাহসিকতার সাথে মিশন ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যায়। অবশেষে তারা সফলতা লাভ করে। যুবকরা সীমান্তের ওপার থেকে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ নিয়ে অস্ত্র হাতে ফিরে আসতে শুরু করে। এক গ্রুপের পর আরেক গ্রুপ রওনা হয়ে যায়। যাওয়া-আসার এই ধারা অব্যাহত থাকে। তারা ধাপে-ধাপে তাদের গোপন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু করে।

মুসলিম মুত্তাহাদা মাহাযকে নির্বাচনে হারিয়ে দেওয়ার পর সংগঠনের নেতা-কর্মীদের ধরপাকড় ও নির্যাতন-নিপীড়নের অভিযানে অন্যতম ভূমিকা রেখেছিল গুরুত্বপূর্ণ এক পুলিশ অফিসার আলী মোহাম্মাদ বাটালি। যুবনেতা এজাজ ডার-এর নেতৃত্বে চার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক এই আলী মোহাম্মাদকে পথ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা হাতে নেয়। যুবকরা আলী মোহাম্মাদের বাড়িতে আক্রমণ চালায়। কিন্তু আলী মোহাম্মদ অল্পের জন্য রক্ষা পেয়ে যায়। সংঘর্ষে এজাজ ডার শাহাদতবরণ করেন। অন্যরা পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করতে সক্ষম হয়। চার কাশ্মিরি যুবকের বন্দুক হাতে একজন পুলিশ অফিসারের বাসভবনে হামলার খবর আগুনের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সবার মুখে বিস্ময়, কাশ্মিরি যুবকদের হাতে কী

অস্ত্র আছে! কাশ্মিরি যুবকরা পুলিশ অফিসারের বাড়িতে ঢুকে হামলা করার সাহস রাখে!

বাস্তবিক সে-সময় একজন কাশ্মিরি যুবকের হাতে অস্ত্র থাকা এবং কারও বাড়িতে ঢুকে হামলা করা সাধারণ মানুষের চোখে অবিশ্বাস্য ও বিস্ময়করই ছিল। কারণ, তারা পূর্ব থেকে এর কিছুই জানত না। কিন্তু আমি এ খবরে মোটেও বিস্মিত হইনি। কেননা, আমি এ সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবহিত ছিলাম।

যাহোক, ঘটনার পর সরকার তৎপর হয়ে ওঠে। পুলিশ বেছে-বেছে সেই যুবকদের গ্রেফতার করতে শুরু করে, যারা বিগত নির্বাচনে মুসলিম মুত্তাহাদা মাহাযের পক্ষে কাজ করেছিল।

এই ধরপাকড়ের ধারাবাহিকতায় আলুচাবাগের হেলাল আহমাদ বেগ-এর বাড়িতে পুলিশ হানা দেয় এবং তাকে না পেয়ে তার পিতাকে বেদম প্রহার করে রেখে যায়। এলাকার মানুষ সশস্ত্র সংগ্রামে হেলাল বেগের সম্পৃক্ততার কথা শুনে বিস্মিত হয়ে পড়ে। একটি হালকা-পাতলা সাধাসিধা লাজুক ও অল্পবয়স্ক নিরীহ ছেলেও কি দেশের সরকারের বিরুদ্ধে কোনো সংগঠিত সশস্ত্র দলের সদস্য হতে পারে? বিষয়টি অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাসে আনতে পারেনি। কিন্তু যেহেতু পুলিশি নির্যাতনের ভয়ে হেলাল আত্মগোপন করেছিল, তাই তার প্রতি মানুষের সন্দেহ হওয়ারও কারণ ছিল। হেলাল বেগ-এর সশস্ত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণের বিষয়টি ছিল আলুচাবাগের মানুষের জন্য গৌরবের বিষয়।

আমিও একসময় আলুচাবাগের বাসিন্দা ছিলাম। সেখানে আমার বাপের বাড়ি। তাই আমিও নিজেকে এই গৌরবে অংশীদার বানিয়ে নিলাম। হেলাল বেগ-এর সঙ্গে শৈশবে আমার অনেক দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে, আলাপ পরিচয় ছিল। কিন্তু বিয়ের পর এ পর্যন্ত আর তাকে দেখিনি। এখন তো লোকটা দেখতে কেমন, তাও আমার মনে নেই। এ ঘটনার পর আমার মনে তাকে এক নজর দেখার আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

মুসলিম মুত্তাহাদা মাহায-এর নির্বাচনে পরাজিত হওয়া ছিল আমাদের জন্য বিরাট এক দুর্ঘটনা। সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণকারী যুবকরা ছিল বাস্তবিকই মুজাহিদ। সেই মুজাহিদ গ্রুপে আমাদের হেলাল আহমাদ

বেগ-এর অংশগ্রহণে আমাদের মর্যাদা বেড়ে গিয়েছিল। তাই তাকে দেখার ও তার সঙ্গে কথা বলার জন্য আমি ও আমার পরিবারের সবাই উদগ্রীব হয়ে পড়ি। কিন্তু হেলার বেগ আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাওয়ায় আর তার দেখা পাইনি।

হেলাল আহমাদ বেগ কোথায় লুকিয়ে ছিল, আমারও তা জানা ছিল না। আমি শুধু এতটুকু জানতাম যে, একটি সংঘবদ্ধ যুবক দল উপত্যকা থেকে অন্য যুবকদের রিক্রুট করে সীমান্তের ওপারে প্রেরণ করেছে এবং তারা সামরিক প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র হাতে ফিরে আসছে এবং নিয়ে আসা অস্ত্রগুলো প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করার জন্য সংরক্ষণ করে রাখছে।

হেলাল বেগ আমার ছোট ভাই বেলালকেও প্রশিক্ষণের জন্য রিক্রুট করে নেয়। কিন্তু নানা কারণে তার ওপারে যাওয়ার প্রোগ্রাম বারবার স্থগিত হতে থাকে। একেক সময় একেকটা বাধা এসে সামনে দাঁড়ায়। অবশেষে ১৯৮৯ সালের শীতের মওসুমে বেলাল তার মিশনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়।

যাওয়ার আগে বেলাল আমাকে বলে গিয়েছিল–

"ভারত আমাদের সঙ্গে যে-আচরণ করছে, তাতে মনে হয়, তারা আমাদেরকে মানুষ নয়, পশু ভাবছে। এটা মূলত আমাদেরই কাপুরুষতা ও হীনম্মন্যতার পরিচয়। দেহ থেকে এই কাপুরুষতা ও হীনম্মন্যতার কম্বল আমাদের ছুড়ে ফেলতে হবে এবং ভারতের নিকট থেকে আযাদি ছিনিয়ে আনার জন্য লড়াই করতে হবে। ভারতের গোলামি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের জিহাদ করতে হবে। যুবকদের মধ্যে জিহাদের অদম্য স্পৃহা সৃষ্টি করতে হবে এবং পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ভারতের উপর আঘাত হানতে হবে।"

তার এই কথাগুলো তখন আমার কিছু-কিছু বুঝে এলেও বিষয়টির পুরো চিত্র আমার চোখের সামনে ছিল না। সত্য বলতে কি, আমিও ভারতের প্রতি বিতৃষ্ণ ছিলাম। ভারতের বিরুদ্ধে আমার অন্তরে এমন একটি স্ফুলিঙ্গ বিদ্যমান ছিল, যা মাঝে-মধ্যে দাউদাউ করে জ্বলে উঠত। পাকিস্তান অবস্থানকালে আমার এই স্ফুলিঙ্গ আরো অধিক প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে।

আমার বিয়ের বয়স তখন বারো বছর। আমি তিন সন্তানের জননী। স্বামী মকবুল জান, পিতা ইউসুফ বেগ ও তিন সন্তানসহ আমি পাকিস্তানে চাচার বাড়িতে বেড়াতে যাই। আমার চাচা হাবীবুল্লাহ বেগ কাবায়েলি সংঘর্ষের পরপর কাশ্মির ত্যাগ করে পাকিস্তান গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিলেন। বেশ ক-বছর পর্যন্ত তার সঙ্গে আমাদের কোনো যোগাযোগ ছিল না। সত্য বলতে কি, আমি আমার চাচাজানকে চিনতামও না। কারণ, তিনি যখন কাশ্মির ত্যাগ করেন, তখন আমি একেবারে ছোট। যখন প্রথমবারের মতো তিনি পাকিস্তান থেকে কাশ্মির বেড়াতে আসেন, তখন সবেমাত্র আমি যৌবনে পা দিয়েছি তিনি এক মাস আমাদের বাড়িতে ছিলেন। সে-সময়ে বয়সে কম হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমার আব্বা-আম্মাকে বুঝিয়ে আমাকে বিয়ে দিয়ে যান। তার সখ ছিল আমাকে বধূবেশে দেখবেন।

পাকিস্তান ফিরে যাওয়ার সময় তিনি আমাদেরকে তার পাকিস্তানের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার দাওয়াত দিয়ে যান। আমরা তার দাওযাত কবুল করেছিলাম। আমাদের সেই পাকিস্তান যাওয়ার সখ পূরণ হতে বারোটি বছর লেগে যায়।

পাকিস্তান গিয়ে আমরা যে কদিন ছিলাম, বেশ আদর আপ্যায়নের মধ্যেই ছিলাম। যেসব কাশ্মিরি পাকিস্তান গিয়ে বসতি স্থাপন করেছে, তারা সবাই আমাদের সাদর আমন্ত্রণ জানান। আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণের এই ধারা এমনভাবে চলতে থাকে যে, আমরা এক বাড়িতে লাঞ্চ করলে ডিনার করতাম আরেক বাড়িতে। এক বাড়িতে নাস্তা খেতাম তো চা পান করতাম অন্য বাড়িতে।

সে-সময়ে এক কাশ্মিরি শিয়া আমাদের দাওয়াত করেন। খানাপিনার পর কাশ্মিরের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা ওঠে। একপর্যায়ে মেজবান আমাদের তিরষ্কার করতে শুরু করেন। তিনি কাশ্মিরি জনগণকে কাপুরুষ মন্তব্য করেই ক্ষান্ত হননি, এমনও বলেছেন যে, আমরা ব্রাহ্মণের জাত, আমরা হিন্দুস্তানী হয়ে গেছি। তার মতে, কাশ্মির হলো পাকিস্তানের ধমনী আর আমরা পাকিস্তানের সেই ধনমীটাকে কাফির-মুশরিকদের হাতে তুলে দিয়েছি।

তার বক্তব্য হলো–

“আমাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র আত্মমর্যাদাবোধ নেই। আমরা মুসলমান হয়ে হিন্দুদের অধীনে বসবাস করছি। কাফির-মুশরিকদের আনুগত্য করছি। হিন্দুস্তান মুসলমানদের বড় দুশমন। ভারত বিভক্তি থেকে এ পর্যন্ত হিন্দুস্তানে অসংখ্য মুসলিম-বিধ্বংসী দাঙ্গা হয়েছে। সেসব দাঙ্গায় মুসলমানদের শুধু নির্মমভাবে হত্যা-ই করা হয়নি, তাদের সহায়-সম্পদও লুট করা হয়েছে, দোকানপাট, কলকারখানা, বাড়িঘর ভস্মীভূত করা হয়েছে, মুসলিম নারীদের সম্ভ্রমহানি করা হয়েছে। এ সবকিছু দেখা সত্ত্বেও তোমরা সেই হিন্দুস্তানের অধীনে বসবাস করছ, তাদের বানানো পুতুল শাসকদের আনুগত্য করছ।”

মেজবানের কথাগুলো সেদিন আমার মনে দারুণ রেখাপাত করে, কথাগুলো আমার শিরায় শিরায় মিশে যায়, যা পরবর্তী কালে প্রজ্জ্বলিত স্ফুলিঙ্গের রূপ ধারণ করে।

আমার ছোট ভাই বেলাল আহমাদ বেগ তার ভগ্নিপতির কারখানায় কাজ করত। ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসের ভোরবেলা যথারীতি সে কারখানায় চলে যায়। দিনটি ছিল সোমবার। কারখানায় গিয়ে সে ছোট ভাই ফিরোজের হাতে একটি চিঠি দিয়ে বলে দেয়, এটি বড় ভাই শাকিল বেগের হাতে পৌঁছিয়ে দিয়ো। সন্ধ্যায় ফিরোজ বাড়ি এসে বেলারের চিঠিটা শাকিলের হাতে দেয়।

শাকিল চিঠিটা খুলে পড়তে শুরু করে–

“আমি ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ এক মিশনে যাচ্ছি। আপনারা আমাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন না এবং আমার নিরুদ্দেশ হওয়ার কথাও জানাজানি হতে দিবেন না। ইনশাআল্লাহ আমি এক মাস পর ফিরে আসব

পত্রখানা পাওয়ার পর আমার পিত্রালয়ে রীতিমতো মাতম শুরু হয়ে যায়। তাদের কারও বুঝে আসছিল না, এসব কী ঘটছে। কাশ্মিরি মুসলমানদের ভারতের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা তাদের কাছে ছিল এক অশ্রুতপূর্ব কথা। ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা মুখে আনা ছিল তখন এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

এই একটুখানি একটা ছেলের সীমান্তের ওপারে যাওয়া ছিল 'বাগের দুধ দোহন'-এর নামান্তর। আর আমার পিত্রালয়ের লোকদের দৃষ্টিতে এটা পাগলামি ছাড়া কিছু নয়। আমার বাবা-মা, ভাই-বোন সকলের বুকফাটা কান্না আসে। কিন্তু ক্রন্দন করারও তো উপায় নেই। কারণ, বেলাল বিষয়টা জানাজানি করতে নিষেধ করে দিয়েছে।

পরদিন ভোরবেলা আমার এক ভাই এসে আমাকে নিয়ে যায়। আমিও বেলালের চিঠি সম্পর্কে অবহিত হই। আমি চিঠিখানা পাঠ করি। সঙ্গে-সঙ্গে আমি চিঠির বক্তব্যের গভীরে পৌঁছে যেতে সক্ষম হই। ঘরের সবাইকে ধৈর্যধারণের পরামর্শ দিই এবং সতর্ক করে দিই, বাইরের কেউ যেন এ ব্যাপারে কিছু জানতে না পারে। আমি সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করি, সীমান্তের ওপারে একা আমাদের বেলালই যায়নি, আরো অনেক যুবকও গিয়েছে, আরো অনেকে যাবে। চিন্তার কোনো কারণ নেই।

"আচ্ছা, আমাদের বেলাল ফিরে এসে কি ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে?" আমার আব্বা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। তার প্রশ্নের ধরন এমন যে, তার মতে এটা অসম্ভব ব্যাপার।

জবাবে আমি বললাম, জানি না, বেলাল ফিরে এসে কী করতে পারবে। তবে আপনি দেখবেন, অদূর ভবিষ্যতে এখানকার অনেক অসম্ভবই সম্ভব হয়ে যাবে।

আমি আমার পিতা, ভাই শাকিল ও ফিরোজকে নিজ-নিজ কাজে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিই এবং মাকে সঙ্গে করে আমার নটিপুরার বাড়িতে নিয়ে আসি। পুত্রের বিরহে তিনি চরম বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন।

আমার ছোট বোন সংবাদ পেয়ে বিষয়টা জানার জন্য আমার বাড়িতে এল। আমি তাকেও শান্ত করার জন্য কিছুদিন আমার বাড়িতে রেখে দিই। সেই পরিস্থিতিতে আমাকে মুরুব্বী হয়ে মা ও বোনকে সান্ত্বনা দিতে হয়েছিল।

আমার মা ও বোন পালাক্রমে কিছুদিনের জন্য বাড়িতে যেতেন আবার আমার কাছে ফিরে আসতেন। এভাবে এক মাস কেটে যায়। হঠাৎ একদিন লোকমুখে খবর ছড়িয়ে পড়ল, বেলাল ফিরে এসেছে। তখন মা ও বোন আলুবাচাগের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। বেলালের ফিরে আসার

সংবাদ শুনে আমি তাকে একনজর দেখার জন্য অস্থির হয়ে পড়ি। কিন্তু ফিরে এসে সে সোজাসুজি বাড়িতে না এসে হঠাৎ করে কোথায় যেন লুকিয়ে যায়। আমি লোকমুখে শুনলাম, তারা বেলালকে অমুক জায়গায় দেখেছে, তমুক জায়গায় দেখেছে। একজন বলল, আমি তাকে ঈদগাহে দেখেছি। আরেকজন বলল, আমি বেলালকে ট্যাক্সিতে করে ঐদিকে যেতে দেখেছি। এসব শুনে আমি আরও বিচলিত হয়ে পড়ি। ভাইটাকে আমার বুকে জড়িয়ে নিতে মন চাইছিল। তার সেই হাত দুটিতে আমার চুমো খেতে ইচ্ছে হচ্ছিল, যে- হাতে সে মাতৃভূমির আযাদির জন্য বন্দুক ধারণ করেছে।

কাশ্মিরকে আযাদ করার জন্য আমার ভাই জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, আমার এর চেয়ে বড় গৌরব আর কি আছে! আহ! আমি যদি পুরুষ হতাম! কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার আমার মনে হচ্ছিল, কে যেন আমাকে বলছে, প্রয়োজন কী, নারী হয়েও তুমি পুরুষ অপেক্ষা বড় কাজ করতে পার। ওঠো, অলসতা ছেড়ে গাঝাড়া দিয়ে দাঁড়াও, কাজ করে দেখাও।

আমার বোরকা পরার অভ্যাস ছিল না। কিন্তু আজ আমি বোরকা পরে মুজাহিদ ভাইয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। আমি শুনেছি, বেলাল নাকি দাড়ি রেখেছে। ভাবলাম, ভাই আমাকে বেপর্দা দেখে অসন্তুষ্ট হয় কিনা। আমি স্থানে-স্থানে বিভিন্নজনকে আমার মুজাহিদ ভাই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুরু করলাম।

এ সময় আমার মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সংবাদ শুনে হেলাল আহমাদ বেগ মাকে দেখতে এলেন। দেখামাত্র মা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং মাথায় চুম্বন করে কাঁপা কণ্ঠে বললেন, মনে হচ্ছে, আমি আমার বেলালকে জড়িয়ে ধরেছি। বেলাল বলল, হ্যাঁ, আম্মাজান, আমিও আপনার সন্তান। মা বললেন, হ্যাঁ, তা ঠিক।

মা হেলাল বেগকে বেলাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, আমার বাছা কোথায়? ছেলেটা আমাদের দেখা দেয় না কেন? আমার ওকে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। হেলাল বেগ মাকে বলল, আমি বেলালকে সঙ্গে করে আপনাদের কাছে নিয়ে আসব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ও যেখানেই থাকুক নিরাপদ আছে।

সে-সময়েই একদিন মা অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার জন্য ট্যাক্সিতে বসে আছেন। এমন সময়ে হঠাৎ তার সামনে-পেছনে, ডানে-বায়ে চারটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়ে যায়। তার একটাতে বেলাল, মুশতাক, আলতাফ ও শাহীন বসা। তারা ট্যাক্সি থেকে নেমে আসে। দেখে মা-ও ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়েন। আনন্দের আতিশয্যে মা বেলালকে বুকে জড়িয়ে ধরতে উদ্যত হন। কিন্তু বেলাল মাকে রাস্তায় এসব করতে বারণ করে বলল, আপনি ঘরে যান; আমরাও আসছি।

চার যুবক মায়ের পেছনে-পেছনে ঘরে ঢোকে। তারা এখানে বসেই সিদ্ধান্ত নেয়, আগামীকাল নটিপুরায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসবে। আমি অধীর অপেক্ষায় প্রহর গুণতে শুরু করলাম।

বেলাল আহমাদ বেগ-এর আমার বাড়িতে আগমন

পরিকল্পনা অনুযায়ী আমার ভাই বেলার আহমাদ বেগ আমার বাড়িতে আসে। সঙ্গে আসে হেলাল, নেছার যোগি, ওমর মুখতার, আলতাফ খান ও আরো কয়েকজন যুবক। তারা সবাই সশস্ত্র। আমার ঘরে কাশ্মিরের এই মুজাহিদদের পদধূলি পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করলাম। আমি একবার তাদের প্রতি একবার আমার ঘরের প্রতি তাকাতে লাগলাম। আমি যে এত বড় ভাগ্যবতী মহিলা আমার যেন তা বিশ্বাসই হচ্ছিল না। গর্বে আমার বুকটা ফুলে গেছে। মনে হচ্ছিল, যেন আমার ঘরে কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেছে।

কাশ্মিরি যুবকদের সশস্ত্র অবস্থায় দেখে আমার মনে হলো, যেন শত-শত বছরের গোলামির পর আমার ঘরে আযাদি এসে গেছে। এই সশস্ত্র যুবকদের আমার কাছে মনে হলো, যেন এরা নিষ্পাপ ফেরেশতা, যারা আমাকে কামিয়াবির সংবাদ জানাতে আমার ঘরে এসেছে। সশস্ত্র যুবকদের আগমনে আমার মাথা গর্বে উঁচু হয়ে গেছে। আমার বারবার সন্দেহ হচ্ছিল, এ আমি স্বপ্ন দেখেছি না তো। এই যুবকরা আমার বছর বছরান্তের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করে দিয়েছে। আমার ঘরে তাদের এই আগমন বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ এক শুভ লক্ষণ এর চেয়ে কম নয়। তারা আমার সম্পদ। তারা আমার মাথার তাজ। আমি তাদের যেতে দেব কেন? তাই আমি তাদেরকে আমার ঘরেই থেকে যাওয়ার প্রস্তাব দিলাম। বেলাল আহমাদ বেগ আমার প্রস্তাব কবুল করে নেয়। আমার ঘরে নতুন করে আনন্দের জোয়ার আসে।

আমার ভাই বেলাল আহমাদ বেগ এখন একটি জিহাদি সংগঠনের একজন দায়িত্বশীল। সংগঠনের নাম 'স্টুডেন্টস লিবারেশন ফ্রন্ট'। সংক্ষেপে এসএলএফ। আমার ঘর এখন এই সংগঠনের প্রধান কার্যালয়। ধীরে-ধীরে এসএলএফ-এর অন্যান্য নেতা-কর্মীরাও আমার ঘরে আসা-যাওয়া করতে শুরু করে। এখান থেকেই তাদের সব ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে।

এখন দিন-রাত বিপুলসংখ্যক সশস্ত্র যুবক আমার ঘরে আসা-যাওয়া করছে। আমি তাদের জন্য ক্যাম্প খুলে দিলাম। কারও পোশাকের প্রয়োজন দেখা দিলে আমি সেই প্রয়োজন পূরণ করার চেষ্টা করছি। কারও জুতা কিংবা বুটের প্রয়োজন হলে আমি তার ব্যবস্থা করছি। আমি আগেই সবাইকে জানিয়ে রেখেছি, জীবনের প্রয়োজনাদির ব্যাপারে নিশ্চিত থেকে তোমরা কাজ করে যাও। যখনই কোনো জিনিসের প্রয়োজন হবে, বড় বোন মনে করে আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ো। আমি আমার ঘরটা মুজাহিদদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিলাম।

আমার ঘরে সশস্ত্র যুবকদের আনাগোনা দেখে নটিপুরার অধিবাসীরা তথা আমার প্রতিবেশীরা; বিশেষ করে আশপাশের দোকানদাররা আমার বাড়ির প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখতে শুরু করে দেয়। আমার ঘরটাকে 'মুজাহিদ মনযিল' মনে করে তারা নিজ উদ্যোগেই এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়, যাতে কেউ এ-ঘরের প্রতি বাঁকা দৃষ্টিতে দেখার সাহস দেখাতে না পারে।

অল্প সময়ের মধ্যে আমার বাড়ি ও আমার পরিবার এলাকার মানুষের কাছে সম্মানের পাত্র হয়ে যায়। দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন মুজাহিদদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আসতে শুরু করে। আমার বাড়িটা একটা মেলার রূপ ধারণ করে।

কয়েক মাস পর্যন্ত এই ধারা চলতে থাকে। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে জনসাধারণের ব্যাপক সমর্থন ও অংশগ্রহণ মুজাহিদদের সাহস ও আগ্রহ আরো বাড়িয়ে তোলে। মসজিদে-মসজিদে কাশ্মিরের স্বাধীনতা ও ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার স্লোগান শুরু হয়ে যায়। মানুষ রাজপথে নেমেও মিছিল করতে শুরু করে।

একদিন নটিপুরা, দেলসুজ কলোনি ও আবাদ বস্তির বিপুলসংখ্যক নারী-পুরুষ-শিশু বিশাল এক মিছিল নিয়ে কাশ্মিরের স্বাধীনতার স্লোগান দিতে-দিতে রামবাগ অভিমুখে এগিয়ে যায়। মিছিলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুজাহিদও উপস্থিত ছিল। বেলাল আহমাদ বেগ ও নেছার জোগি মিছিলে আমার সঙ্গে ছিল। অন্যভাবে বলা যায়, আমি তাদের ছায়া হয়ে তাদের সঙ্গে যাচ্ছিলাম।

বেলাল আহমাদ ও নেছার জোগির বিশ্বাসই হচ্ছিল না, এত অল্প সময়ের মধ্যে তাদের মিশন সফলতা লাভ করবে এবং এত দ্রুত জনগণ তাদের আহ্বানে লাব্বাইক বলে ময়দানে নেমে আসবে। মিছিলে জনতার ঢল দেখে মুজাহিদরা সীমাহীন আনন্দিত হয়।

নেছার জোগি আনন্দের আতিশয্যে মিছিলের মধ্যে তার বন্দুকটা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে। মিছিলে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ মানুষ এই প্রথমবারের মতো একজন কাশ্মিরি যুবকের হাতে অস্ত্র দেখতে পেয়ে আনন্দে তালি বাজাতে শুরু করে।

আবেগের অতিশয্যে নেছার জোগি খোলা আকাশের দিকে কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়ে। জনতা নেছার জোগিকে কাঁধে তুলে নেয় এবং আকাশ-বাতাস মুখরিত করে স্বাধীনতার স্লোগান দিতে দিতে সম্মুখ পানে এগিয়ে যায়।

এই অভাবিতপূর্ণ দৃশ্য দেখে আমার দু-চোখে আনন্দের অশ্রু নেমে আসে। কিন্তু এই অশ্রু শুকাতে-না-শুকাতেই হঠাৎ একদিন ভারতীয় পুলিশ নেছার জোগিকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। নেছার জোগির গ্রেফতারের সংবাদ আমার মনে প্রচণ্ড এক ধাক্কা দেয়। আমাদের এই অঞ্চলে একজন মুজাহিদকে গ্রেফতার করার ঘটনা এ-ই প্রথম।

সময়টা ছিল রমযান মাস। সন্ধ্যায় ইফতারের সময় হেলাল আমাকে নেছারের গ্রেফতার হওয়ার সংবাদ দেয়। সংবাদ শুনে আমি অস্থির হয়ে পড়ি। হেলাল আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তারপরও সে আমাকে বিচলিত দেখে বলল– আপনি ধৈর্যধারণ করুন। সাহস হারাবেন না। আমি অতিশীঘ্র নেছার ভাইকে ছাড়িয়ে আনব।

কীভাবে? আমি বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করলাম।

হেলাল বলল, আপনি অপেক্ষা করুন এবং দেখুন কী ঘটে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে নেছার ভাই অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই মুক্ত হয়ে ফিরে আসবে।

আমার পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও হেলাল বলল না সে কীভাবে নেছার জোগিকে মুক্ত করবে। কয়েক দিন পর হঠাৎ খবর পেলাম কাশ্মির ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর মুশিরুল হক, এইচএমটি'র জেনারেল ম্যানেজার খিড়া ও মুশিরুল হকের প্রাইভেট সেক্রেটারি আবদুল গনী অপহৃত হয়েছেন।

এই তিন ব্যক্তির অপহরণের ঘটনার সংবাদে প্রশাসনে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। ঘটনাটা দেশে-বিদেশে সর্বত্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিভিন্ন মহল থেকে অপহৃতদের উদ্ধার করার দাবি উত্থাপিত হয়। সরকারও তাদের উদ্ধারে ব্যাপক তৎপরতা শুরু করে দেয়।

কাশ্মিরে সশস্ত্র সংগ্রামে অপহরণের ঘটনা এটিই প্রথম। তাই ঘটনাটি সর্বত্র বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। সাধারণ মানুষের কাছে এটি একটি অবিশ্বাস্য দুর্ধর্ষ অভিযান। কাশ্মিরে এমন একটি ঘটনা ঘটতে পারে, তা কারও কল্পনায়ও ছিল না।

'স্টুডেন্টস লিবারেশন ফ্রন্ট' এই অপহরণ ঘটনার দায়িত্ব স্বীকার করে। পুলিশ সংগঠনের দায়িত্বশীলদের গ্রেফতার করার জন্য ব্যাপক তৎপরতা শুরু করে। আমার ঘরেও হানা আসতে শুরু করে। শুধু আমার নটিপুরার বাড়িতেই নয়, আলুচাবাগে আমার পিতার বাড়িতেও পুলিশ কয়েকবার হানা দেয়।

এসএলএফ নেছার জোগি, গোলাম নবী বাট ও ফাইয়াজ আহমাদের মুক্তি দাবি করে। এই দাবির পর আমার বাড়িসহ যেখানে-সেখানে পুলিশ হানা ও ব্যাপক তল্লাশি শুরু হয়ে যায়।

অবস্থার ভয়াবহতা আঁচ করে আমি ও আমার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাই। আলুচাবাগের বাড়িতে আমার মা-বাবা, ভাই-বোনদের উপর পুলিশ নির্মম অত্যাচার শুরু করে দেয়, যাতে তারা আমার ও বেলালের ব্যাপারে সন্ধান দেয় এবং মুশিরুল হক ও খিড়া সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে।

অপহৃতদের উদ্ধারের লক্ষ্যে পুলিশ সর্বত্র এমন কঠোর প্রহরা ও নজরদারি বসায় যে, অপহৃতদের প্রয়োজনে স্থানান্তর করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। গভর্নর জগমোহন স্থানে-স্থানে সোর্স বসিয়ে রেখেছেন। দেশ-বিদেশ থেকে জগমোহনের উপর মুজাহিদিদের দাবি পূরণ করে অপহৃতদের মুক্ত করে আনার চাপ যত বাড়তে থাকে, জগমোহন ততোধিক গোঁড়ামির পথ অবলম্বন করতে থাকেন। এসএলএফ-এর পক্ষ থেকে হুমকি দেওয়া হয়, যদি তাদের দাবি পূরণ করে বন্দি মুজাহিদদের মুক্তি দেওয়া না হয়, তাহলে তারা অপহৃতদের হত্যা করে ফেলবে।

কিন্তু মুখে হুমকি দিলেও অপহৃতদের হত্যা করার পরিকল্পনা মুজাহিদদের ছিল না। যখন ভারতীয় বাহিনী ও পুলিশের দ্বারা মুজাহিদরা চরমভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়ে এবং মিশনের সফলতা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন মুজাহিদরা খিড়াকে বটামালনা নামক স্থানে নিয়ে ছেড়ে দেয়। গায়ের পোশাক পাল্টিয়ে তাকে মুক্তি দিয়ে দেয়। ছাড়ার সময় তাকে বলে দেওয়া হয়, যেন কন্ট্রোল রুমে গিয়ে তিনি পুলিশের হাতে ধরা দেন এবং বলেন, আমি জঙ্গল থেকে অপহরণকারীদের হাত থেকে পালিয়ে এসেছি।

কিন্তু খিড়া পুলিশ কন্ট্রোল রুমে না গিয়ে পার্শ্ববর্তী একটি টহল বাহিনীর কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দেন। সেই টহল বাহিনী ওয়ারলেস মারফত হেডকোয়ার্টারে সংবাদ জানায়। কী জানি, ওরা সেখান থেকে কী নির্দেশ পেল, রিপ্লাই পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তারা সেখানেই খিড়াকে গুলি করে হত্যা করে ফেলে।

কারফিউ থাকা সত্ত্বেও আমাদের যুবকরা পরিস্থিতির উপর কঠোর নজর রাখতে সচেষ্ট থাকে। পুলিশের হাতে খিড়ার নিহত হওয়ার সংবাদ পেয়ে তারা বিচলিত হয়ে পড়ে। কারণ, ইতিমধ্যে তাদের অপর একটি দল মুশিরুল হককে নিয়ে লাসজান অভিমুখে রওনা হয়ে গেছে। ওখানে তাকে ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা আছে। তাছাড়া পুলিশ খিড়াকে হত্যা করে তার দায়ভার এসএলএফ-এর উপর চাপানোর কারণে এলাকায় নতুন করে সাম্প্রদায়িক সংঘাত সৃষ্টি হওয়ারও আশংকা আছে।

গভর্নর জগমোহন খিড়াকে হত্যা করে যে ষড়যন্ত্র আঁটে, তা এসএলএফ-এর জন্য বিরাট এক পরীক্ষার চেয়ে কম নয়। এমতাবস্থায়

যদি মুশিরুল হককে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখা হয়, তাহলে সংগঠনের উপর সাম্প্রদায়িকতার ছাপ পড়ে যাবে নিশ্চয়ই। তাই তড়িঘড়ি করে মুশিরুল হককে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা হয় এবং দুজন যুবককে তৎক্ষণাৎ লাসজান অভিমুখে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যাতে তারা মুশিরুল হককে নিয়ে যাওয়া সাথীদের নতুন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত করে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তারা পথ ভুলে লাসজানের পরিবর্তে বারজানের পথে রওনা হয়। কাজ আর হলো না। প্রথম দলটি মুশিরুল হককে লাসজানের একস্থানে ছেড়ে দিয়ে আসে। পুলিশ খিড়ার মতো তাকেও খুন করে ফেলে।

এবার আবদুল গনীর মুক্তিলাভের পালা। তাকে ছেড়ে দিয়ে বলা হলো, এদিক-ওদিক কোথাও না গিয়ে সোজা বাড়ি চলে যাও। কিন্তু তা না করে আবদুল গনী চলে যায় পার্শ্ববর্তী এক বাংকারে। ভারতীয় বাহিনী সেখানে তাকেও হত্যা করে লাশটা রাস্তায় ফেলে দেয়।

এসএলএফ হুমকি দিয়েছিল, তাদের দাবি মানা হলে অপহৃতদের হত্যা করা হবে। এখন তারা একে-একে সবাই খুন হলো। খুন করল সরকার। কিন্তু দোষ চাপানো হলো এসএলএফ'র উপর। অপহরণকারীদের নিরাপদে রাখতে ব্যর্থ হয়ে মুজাহিদরা তাদের মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু মুক্তিদানের পদ্ধতির ভুলে লোকগুলো প্রাণ হারাল এবং সরকারও মুজাহিদদের নামে দুর্নাম ছড়াবার সুযোগ পেয়ে গেল।

এভাবে ছেড়ে না দিয়ে যদি তারা অপহৃতদের সরাসরি কাশ্মির পুলিশ কিংবা সাংবাদিকদের হাতে তুলে দিত, তাহলে ঘটনাটা এভাবে ঘটত না। কিন্তু ঘটনা যে এমন ঘটতে পারে, জগমোহন যে এমন ষড়যন্ত্র পাকাতে পারে, অনভিজ্ঞ মুজাহিদরা আগে তা আন্দাজ করতে পারেনি। মুজাহিদদের ধারণা ছিল, তাদের দাবি পূরণ করা ছাড়াই অপহৃতদের মুক্তি পাওয়াকে সরকার নিজের কৃতিত্ব বলে চিহ্নিত করবে। এই ভুলের জন্য মুজাহিদরা অনুতপ্ত হয় এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হয়ে যায়।

অপহৃতরা নিহত হওয়ার পর পুলিশ ও ভারতীয় বাহিনীর হানা-তল্লাশি বন্ধ হয়ে যায়। মুজাহিদরা পুনরায় ধীরে-ধীরে সংগঠিত হতে শুরু করে।

আমার বাড়িতে মুজাহিদদের আনাগোনা আবার শুরু হয়ে যায়। তবে পূর্বের তুলনায় অনেক সতর্কতার সাথে। আটক মুজাহিদদের মুক্ত করার জন্য তারা নতুন পরিকল্পনা হাতে নেয়।

তিন বছর পর ডক্টর খুসার অপহৃত হওয়ার সংবাদ পেলাম। আবার জেগে ওঠে সরকার। শুরু হয় অনুসন্ধান। অনুসন্ধানের নামে হয়রানি আর অত্যাচার-নির্যাতন। কিন্তু প্রশাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো। ডক্টর খুসাকে পুলিশ কোথাও খুঁজে পেল না। অপহরণকারীরা বিনিময়ে আটক তিন মুজাহিদের মুক্তি দাবি করল। অগত্যা সরকার নেছার জোগিসহ তিন মুজাহিদকে মুক্তি দিয়ে দেয়। অপহরণকারীরাও ডক্টর খুসাকে ছেড়ে দেয়। সমস্যার আপাতত একটি সমাধান হলো। পরিস্থিতিও শান্ত হলো।

কয়েক দিন পরের ঘটনা। হেলাল আহমাদ বেগ খালেদ রাজাকে জরুরি এক মিশনে ইসলামাবাদ প্রেরণ করে। সনগম পোলের নিকট পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে ফেলে। সংবাদ পাওয়ামাত্র মুজাহিদরা নিজ-নিজ দায়িত্বে সবাই নিরাপদ আশ্রয়ে আত্মগোপন করে। হেলাল আহমাদ বেগও তার অবস্থান পরিবর্তন করে ফেলে।

কারণ, চাপের মুখে খালেদ রাজা মুজাহিদদের অবস্থানের কথা বলেও দিতে পারে। কিন্তু কয়েক দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও যখন আমার বাড়িতে বা অন্য কোথাও হানা হলো ন, তখন ধীরে-ধীরে হেলাল বেগ ও অন্যান্য সাথীরা আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে। আমার ঘরে তাদের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়।

সে সময়েরই ঘটনা। একদিন চারজন মুজাহিদ গুরুত্বপূর্ণ এক কাজে যাচ্ছিল। এজাজ ও বেলালের একস্থানে এবং সালিম ও মুশতাককে অন্য এক স্থানে যাওয়ার কথা। রওনা হওয়ার সময় আমি সালিমকে উদ্দশ্য করে বললাম, তুমি কিন্তু সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে চলবে। ধরা খেলে কোনো অবস্থাতেই কোনো তথ্য যেন ফাঁস না হয়।

কেন জানি সে সময়ে হঠাৎ করে তাদের ব্যাপারে আমার মনে ভয় জেগে গেল। এত ভয় তো আমার পাওয়ার কথা নয়। আবার কেনইবা জানি আমার মন বলে উঠল, সালিম আর ফিরে আসবে না। শত চেষ্টা করেও তখন আমি নিজেকে শান্ত করতে পারছিলাম না।

যাহোক, চার যুবক দুভাগে বিভক্ত হয়ে দুপথে রওনা হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর বারামুল্লার আবদুল কাইয়ুম এসে সংবাদ দিল, সালিম জরগরকে এইমাত্র রামবাগ পুলের নিকট থেকে পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে।

সংবাদটা কানে আসামাত্র মনে হলো, যেন আকাশটা ভেঙে আমার মাথায় পড়েছে। আমি নিজেকেই তিরস্কার করতে শুরু করলাম, কেন আমি সলিমের ব্যাপারে দুঃশ্চিন্তা মাথায় ঢুকতে দিয়েছিলাম, কেন আমি আগেই তার ব্যাপারে আশংকাবোধ করেছিলাম!

সলিম জরগরের গ্রেফতার হওয়ার দায়ভার নিজের মাথায় চেপে নিয়ে আমি আফসোস করতে লাগলাম। মনে হলো, যেন আমিই সলিমকে গ্রেফতার করেছি। নিজেকে প্রশ্ন করলাম, পথে তার গ্রেফতার হওয়ার এতই যখন আশংকা ছিল, তাহলে তুমি কেন ওকে যেতে দিলে? কেন তুমি ওকে যেতে বারণ করলে না।

আমি কাইয়ুমকে বললাম, সালিম যেখানে গ্রেফতার হয়েছে, তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে যাও। কাইয়ুম বলল, আপনি ওখানে গিয়ে কী করবেন? আমি বললাম, ওসব বুঝি না; তুমি আমাকে নিয়ে যাও।

আমার জিদ দেখে কাইয়ুম অস্থির হয়ে যায়। তার ধারণা, সংবাদটা আমার মস্তিষ্কে গভীর প্রভাব ফেলেছে। সে আমাকে সান্ত্বনা দিতে শুরু করে। কিন্তু আমি আমার দাবিতে অটল থাকলাম যে, যেকোনোভাবে হোক তুমি আমাকে ওখানে নিয়ে যাও। অগত্যা সে আমাকে তার গাড়িতে তুলে রামবাগ নিয়ে যায়। সেখানে আমি মানুষের প্রচণ্ড ভিড় এবং বিপুলসংখ্যক পুলিশের উপস্থিতি দেখতে পেলাম। জনতা সালিম জরগরের গ্রেফতারের ব্যাপারে বলাবলি করছে। আমি সেখান থেকে দ্রুত কেটে পড়লাম এবং কাইয়ুমকে কিছু না বলে একটা ট্যাক্সিতে চড়ে বসলাম।

আমার ইঙ্গিত পেয়ে চালক স্টার্ট দিয়ে ট্রাক্সি ছুটাল। আমি একটু পর-পর ট্যাক্সি থামিয়ে মুজাহিদদের গোপন অবস্থানগুলোতে গিয়ে-গিয়ে সংবাদ দিতে শুরু করি যে, সালিম জরগর গ্রেফতার হয়েছে, তোমরা সতর্ক হয়ে যাও এবং দ্রুত অবস্থান পরিবর্তন করো। আমি দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে এভাবে মুজাহিদদের সতক্য করতে থাকি।

মিশন শেষ করে ফিরে আসার সময় রামবাগ পৌঁছে পূর্বের অপেক্ষা অধিক ভিড় দেখতে পেলাম এবং পুলিশের উপস্থিতি আগের চেয়ে অনেক বেশি মনে হলো। মন বলল, নতুন কোন ঘটনা ঘটে থাকবে। আমি কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে-না-করতে পুলিশ এসে আমার ট্যাক্সিটা ঘিরে ফেলল। পুলিশ আমার ট্যাক্সিতে তল্লাশি চালাল। আমি মহিলা এবং একা বলে তারা আমাকে ছেড়ে দিল।

এখানে নতুন করে কী ঘটল জানার জন্য আমার মনে প্রচণ্ড কৌতূহল জাগল। আমি এক ব্যক্তিকে ইঙ্গিতে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলাম। লোকটি বলল, হেলাল বেগ ও জাবেদ পুলিশের চোখে ধুলা দিয়ে পালিয়ে গেছে। সেজন্য পুলিশের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি ড্রাইভারকে সারায়েবালার দিকে যেতে বললাম।

সারায়েবালা গিয়ে আমি আমার পিতাকে পেলাম। তার নিকট হেলালের সংবাদ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি কিছু বলতে পারলেন না। আমি এক দোকানীর নিকট গিয়ে হেলাল সম্পর্কে জানতে চাইলাম। দোকানী বলল, হেলাল ভালো আছে, জায়গামতো পৌঁছে গেছে। আমি শান্ত হলাম এবং বাড়ি ফিরে এলাম।

ট্যাক্সিচালক আমার পরিচিত ছিল না। তাই আমার গতিবিধিতে সে বিস্মিত হয়ে পড়ল যে, আমি কে, এসব কি-ইবা করছি। আমি কোথাও একটা দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দোকানদারকে কিছু নির্দেশনা দিয়ে আবার রওনা হলাম। আরেকটু সামনে অগ্রসর হলাম। একজনের সঙ্গে দেখা হলো। গাড়ি থামিয়ে তাকে কোথাও পাঠিয়ে দিলাম। আবার একটু অগ্রসর হলাম। হঠাৎ চালককে গাড়ি থামাতে বললাম। একজনের কানে-কানে কিছু বলে আবার রওনা হলাম। কারও বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থামিয়ে রেখে ঘরে ঢুকে পড়লাম এবং ঘরের নারী-পুরুষ কাউকে বাইরে নিয়ে এসে তৎক্ষণাৎ তাকে কোথাও রওনা করিয়ে দিলাম।

আমার এসব কর্মকাণ্ড ও আচরণ দেখে ট্যাক্সি ড্রাইভার আমাকে রহস্যময়ী নারী ভাবতে শুরু করল। আমার মনে হলো, হয়ত লোকটা আমাকে মানসিক বিপর্যস্ত নারী ভেবে বসেছিল। কিন্তু আমি তাকে কিছু বুঝতে দিতে অপারগ ছিলাম। সবশেষে যখন নিশ্চিত হলাম, আশপাশের সব জায়গায় সংবাদ পৌঁছে গেছে, তখন আমি বাড়ি ফিরে এলাম।

বলাবাহুল্য, একটি সশস্ত্র সংগঠনের কোনো সদস্য যদি গ্রেফতার হয়, তাহলে সংগঠনের অন্যান্য সদস্যদের তৎক্ষণাৎ অবস্থানই পরিবর্তন করতে হয় না, অস্ত্রশস্ত্রও স্থানান্তর করে লুকিয়ে ফেলতে হয়। অর্থাৎ– সংগঠনের গোটা সিস্টেমটাই মুহূর্তের মধ্যে পাল্টে ফেলতে হয়। এই সিস্টেম পরিবর্তনের যে দৌড়-ঝাঁপ পোহাতে হয়, তা কেবল সেই ব্যক্তি-ই অনুমান করতে পারে, যার উপর এই দায়িত্ব চাপে। আমি সেদিন বিষয়টা হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছিলাম।

আমি যখন বাড়িতে ফিরে আসি, ততক্ষণে মুজাহিদদের কেউ-কেউ ফিরে এসেছে। তারপরও কতজন আসবে, কে-কে আসবে, তার কিছুই আমার জানা ছিল না। এটা কখনও জানা সম্ভব হতো না। কিন্তু তারপরও যথারীতি সবার জন্যই রান্না করতে হতো।

দিনভর ছোটাছুটি করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এসে আমি মুজাহিদদের জন্য রান্নার কাজ শুরু করে দিলাম। কাজের জন্য বাইরের কোনো লোক নিয়োগ করা সম্ভব ছিল না। সেজন্য পুরো দায়িত্ব চাপল আমার ও আমার ছেলেমেয়েদের উপর। সাধারণত আমি প্রতিদিন দশ থেকে বারোজন মুজাহিদের জন্য রান্না করতাম। কোনো-কোনোদিন পনেরো-বিশজন যুবকও আমার ঘরে খানা খেত। আমি এমনভাবে রান্না করতাম যে, দশজনের স্থানে হঠাৎ পনেরোজন হয়ে গেলেও যাতে সমস্যা না হয়।

আমি মুজাহিদদের জন্য যে পাতিলে রান্না করতাম, তার নাম রাখা হয়েছিল 'জান বাবা সাহেবের পাতিল'। জান বাবা নামক এক বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর আস্তানায় সব সময় লঙ্গরখানা চালু থাকত। আমার অবস্থাও ছিল মোটামুটি সেই রকম। আমার অর্থ-সম্পদ ও শক্তি-সামর্থ্য মুজাহিদদের কিছুটা উপকারে আসছিল বলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করতাম। তাতে আমার যে কী আনন্দ লাগত, তা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। একটি মুসলিম ভূখণ্ডে ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা আন্দোলনের কিছুটা হলেও উপকার করতে পারা সত্যিই সৌভাগ্যের ব্যাপার।

আমি রান্না-বান্না করে মুজাহিদদের আহার করিয়ে আপাতত যার-যার নিরাপদ অবস্থনে চলে যেতে বলতাম। কারণ, এখানে পুলিশি হানা হবে তা নিশ্চিত। আমার নির্দেশমতো একে-একে সবাই চলে গেল।

বেশি বিলম্ব হলো না। আমার বাড়িতে একের-পর-এক পুলিশি হানা শুরু হয়ে গেল। আমার পরিবারের সকল সদস্যকে পুলিশ মারধর করতে শুরু করল। মুজাহিদদের সন্ধান পাওয়ার জন্য তারা আমার নির্দোষ সন্তানদের উপর নির্যাতন চালিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, আমাকেও একাধিকবার চুল ধরে টানা-হেঁচড়া করে ও অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে। প্রতিটি হানার সময় পুলিশ আমার স্বামীর উপর নির্মমভাবে অত্যাচার চালায়।

এই ধারা অব্যাহত থাকল। একপর্যায়ে পুলিশ মুশতাককে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। কিছু দিন পর আমার ভাই বেলালও গ্রেফতার হয়।

নেমে এল বিভীষিকা

বেলাল আহমাদ বেগকে গ্রেফতার করে পুলিশ বিজয়োৎসবে মেতে ওঠে। তারা বেলালকে হেলাল আহমাদ বেগের ভাই মনে করেছিল। সেজন্য হেলালের সন্ধানে তারা আমাদের ওপর চাঁপ প্রয়োগ করতে শুরু করে। শুরু করে নির্যাতন। বেলাল আহমাদ বেগের গ্রেফতারিতে বেগ পরিবারের ওপর বিভীষিকা নেমে আসে। কি পুরুষ, কি নারী, কি শিশু, কি বৃদ্ধ এই পরিবারের যে কাউকে নির্দয়ভাবে মারপিট করতে শুরু করে পুলিশ। সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হন আমার আলসার রোগী স্বামী। আব্বাজানের পুলিশি নির্যাতন সহ্য করার মতো শক্তি ছিল না। তাই তিনি আত্মগোপন করে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। তারপরও তিনি নির্যাতনের শিকার হয়ে পড়তেন।

লাগাতার পুলিশি হানা ও অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পেতে আমি আমার স্বামী এবং দুই পুত্র মুদ্দাস্‌সির ও মাসাররাতকে সন্ধ্যা হলেই প্রতিবেশী কোনো বাড়িতে পাঠিয়ে দিতাম। ছোট মেয়েটিকে নিয়ে আমি ঘরে থাকতাম। কখনও মা এসে আমার সঙ্গে থাকতেন, কখনও শাশুড়ি।

পুলিশি হানা, তল্লাশি ও নির্যাতনের ধারা যখন ব্যাপক রূপ লাভ করে, তখন আমার এক প্রতিবেশী মহিলা আমাকে বাড়ি ছেড়ে তার বাড়িতে রাত কাটানোর পরামর্শ দেন। কিন্তু আমি ঘরদোর খালি রেখে অন্য জায়গায় থাকার পরামর্শ গ্রহণ করতে পারলাম না। আমার অনুপস্থিতিতে সংগঠনের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে ভেবে আমি বাড়ি ত্যাগ করা সমীচীন মনে করলাম না। তবে কদিনের মধ্যে যখন পরিস্থিতি আরো খারাপ ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল, পুলিশ রাতেও আমার বাড়িতে হানা দিতে শুরু করল, তখন আমিও বাড়ি ত্যাগ করতে বাধ্য হলাম। আমি উল্লেখিত সেই প্রতিবেশী

মহিলার সঙ্গে গিয়ে থাকতে শুরু করলাম। তবে আমি স্থান পরিবর্তন করলাম বটে; কিন্তু আমার নজর চব্বিশ ঘণ্টা আমার বাড়ির উপরই নিবদ্ধ থাকল।

বেলালের গ্রেফতারিতে মুজাহিদদের হেডকোয়ার্টার (আমার বাড়ি) লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। আমি পার্শ্ববর্তী বাড়িতে অবস্থান নিয়ে কর্মকর্তাদের জরুরি নির্দেশনা দিতে থাকি। আমার সঙ্গে কারও সাক্ষাতের প্রয়োজন হলে কিংবা কারও প্রতি আমার কোনো বার্তা পৌঁছানোর প্রয়োজন হলে তারও ব্যবস্থা করে রাখি।

সে সময়ের ঘটনা। ১৯৯০ সালের মার্চ মাস। হেলাল একদিন আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে। বরফপাতের মওসুম। টহল পুলিশ হেলালকে দেখে ফেলে। পুলিশ তাকে থামতে নির্দেশ দেয়। কিন্তু হেলাল দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করে। পুলিশ গুলি ছোড়ে। গুলি হেলালের পায়ে বিদ্ধ হয়। হেলাল বেগ বুলেটবিদ্ধ অবস্থায় দেওয়াল টপকে একটা বাড়িতে ঢুকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। গুলির শব্দে সমগ্র এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ এদিক-ওদিক পালাতে শুরু করে। যারা ঘরের বাইরে ছিল, তারা ঘরে ঢুকে লুকাতে শুরু করে আর যারা ঘরের ভেতরে ছিল, তারা ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করতে শুরু করে দেয়। দেখতে-না-দেখতে পুলিশ গোটা এলাকায় ছেয়ে যায় এবং এলাকাটা ঘিরে ফেলে। তারা আহত হেলালকে খুঁজতে শুরু করে।

প্রতিবেশীর ঘরের জানালা দিয়ে আমি এসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করি। হেলালকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে আমি তার দিকে ছুটে যাই। জীবনের মায়া ত্যাগ করে আমি হেলালকে কাঁধে তুলে লুকিয়ে-লুকিয়ে আমার ঘরে নিয়ে যাই এবং ওপর তলার একটা বিছানায় শুইয়ে দিই। তার বুলেটবিদ্ধ পা থেকে রক্ত ঝরছে। আমি তার পায়ে এক খণ্ড কাপড় বেঁধে দিই।

ব্যাপক পুলিশি তৎপরতার কারণে কেউ ঘর থেকে বের হতে সাহস পাচ্ছিল না। দরজা-জানালা বন্ধ করে সবাই চুপচাপ বসে আছে। অথচ হেলাল আহমাদ বেগের ত্বরিৎ চিকিৎসার প্রয়োজন। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ মৃত্যুর কারণ হতে পারে। ঘরে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। আমি ডাক্তার

আনার জন্য যেতে পারি, কিন্তু হেলালকে একা রেখে যাই কী করে। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ি। কী করব কিছুই আমার বুঝে আসছে না। সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। একটা সেকেন্ড ঘণ্টার মতো মনে হচ্ছে। প্রতি মুহূর্তেই আশংকা জাগছে, এই বুঝি হেলাল দুনিয়া থেকে চলে গেল।

অগত্যা হেলাল বেগকে কিছু না বলেই আমি বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে ডাক্তার আনার জন্য বেরিয়ে পড়ি। আমি বের হয়ে ডাক্তারের খোঁজে যাচ্ছি ঠিক, কিন্তু প্রবল এক আশংকা আমাকে সন্ত্রস্ত করে রেখেছে যে, এই ফাঁকে আমার ঘরে পুলিশ অনুপ্রবেশ করে আহত হেলালকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। ডাক্তার নিয়ে বাড়ি ফিরে কক্ষে প্রবেশ না করা পর্যন্ত এই শংকা আমাকে তাড়া করে ফিরে।

ফিরে এসে হেলালকে কক্ষে পেয়ে আমি শান্ত হই। প্রবল ভয় ও শংকা থাকা সত্ত্বেও আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি।

ডাক্তার হেলাল আহমাদ বেগের পা থেকে বুলেট খুলছেন। এ সময় আমি হেলালের ধৈর্যশক্তি ও সহনশক্তি প্রত্যক্ষ করলাম। হেলাল বেগ নিজেই মুখে কাপড় ঢুকিয়ে নিয়েছে, যাতে মুখ থেকে শব্দ বেরুতে না পারে। একদিকে আমার ঘরে যখন হেলাল আহমাদ বেগের অপারেশন চলছে, অপরদিকে পুলিশ তার সন্ধানে ঘরে-ঘরে তল্লাশি চালাচ্ছে।

বিষয়টা দৈব নাকি আল্লাহর ইচ্ছা যে, আশপাশের সব বাড়ির সকল ঘরে তল্লাশি হলো; কিন্তু পুলিশ আমার বাড়িতে ঢুকল না। অপারেশনের পর এখন হেলাল চলাফেলা করতে সক্ষম। আমি আমার বাড়ির তৃতীয় তলায় তার থাকার ব্যবস্থা করে দিই। স্নেহপরায়ণ বড় বোনের মতো আমি তাকে ধরে উঠাতাম-বসাতাম ও বাথরুমে নিয়ে যেতাম। সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমিই তার সেবায় নিয়োজিত থাকি।

শ্রীনগরে কয়েকজন বড় ডাক্তার তাকে দেখতে এলেন। বেশ কজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও এসে তাকে দেখে যান ও অবস্থার খোঁজখবর নেন।

চলাফেরা করার ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার পর হেলাল আহমাদ বেগ প্রয়োজন দেখা দিলে মাঝে-মধ্যে গোপন ঠিকানায় চলে যেত, পরিস্থিতি ভালো হলে আবার ফিরে আসত। কয়েক মাস পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকল। এ সময় মুজাহিদরা পুনরায় সংগঠিত হয়ে আমার ঘরে আসা-

যাওয়া শুরু করল। আমি ও আমার ছেলেমেয়েদের সেবা-শুশ্রূষায় হেলার আহমাদ বেগ অত্যন্ত প্রভাবিত হয়। সে আমাকে 'বহেনজী' (আপা) বলে সম্বোধন করতে শুরু করে। দেখতে-না-দেখতে আমি শুধু মুজাহিদ ও স্বাধীনতাপ্রিয় কাশ্মিরিদেরই 'বহেনজী'তে পরিণত হইনি, বহেনজী যেন আমার নাম হয়ে যায়। মানুষ আমাকে এ নামেই চিনতে শুরু করে। ফোর্স ও ফৌজের তিন শাখা, প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় সরকার সকলের তালিকায়ই আমি 'বহেনজী' বলে পরিচিত হয়ে যাই।

হেলাল আহমাদ বেগের সুস্থতা লাভের পর মুজাহিদগণ ছাড়াও বিভিন্ন রাজনীতিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, ব্যারিস্টার ও অন্যান্য সুহৃদগণ আমার বাড়িতে আসা-যাওয়া শুরু করে। আমি সাবধানতার সাথে আমার স্বামী মকবুল জান ও দুই পুত্রকে রাতে শোওয়ার জন্য অন্য বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে শুরু করি।

কিন্তু আমার এই সাবধানতাই আমার জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। পুত্র মুদ্দাসসির হঠাৎ একদিন এক প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে গ্রেফতার হয়ে যায়। তখন তার বয়স ছিল ১৫ কি ১৬ বছর।

সুপ্রিয় পাঠক-পাঠিকা! আসুন, মুদ্দাসসির-এর গ্রেফতারি ও পরবর্তী কাহিনী তারই মুখে শুনি।

মুদ্দাস্‌সির-এর আত্মকাহিনী

মুদ্দাসসির জানায়, একদিন রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে ইউসুফ জমজমের এক পুত্রের সাথে আমার দেখা হয়। সে বলল, আমি যে ঠিকানায় থাকতাম, সেটি এখন পুলিশের টার্গেটে পড়ে গেছে। তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে রাখো। আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে শুরু করি। হাঁটতে-হাঁটতে আমরা দেশের চলমান পরিস্থিতির উপর মতবিনিময় শুরু করি এবং ভবিষ্যৎ ভাবনায় নিজেদের হারিয়ে ফেলি। পরিচিত শহীদদের নিয়ে আলোচনা করি। ভাবি, তারা কত ভাগ্যবান, আল্লাহপাকের কত মকবুল বান্দা। আমার বয়সী যারা জেলে আটক আছে, তাদের কথাও মনে পড়ে। আমার মনটা ছ্যাৎ করে ওঠে। ভারতীয় বাহিনী ও সিকিউরিটি ফোর্সের নির্যাতনের কথা স্মরণ করে ভাবছিলাম, এই নির্যাতনের ধারা কবে শেষ হবে। কোন দিন আমরা এই জালিমদের অক্টোপাস থেকে মুক্তি পাব?

আমরা একথাও ভাবছিলাম, আমরা যখন স্বাধীনতা অর্জন করব, তখন দেশের পরিস্থিতি কেমন হবে? স্বাধীন জীবনের ধরন কীরূপ হবে ইত্যাদি। দেশের কথিত নেতাদের প্রতি আমাদের রাগ এসে যায়। এই মুহূর্তে যদি ঐ নেতাদের কাউকে রাস্তায় পেয়ে যেতাম, যারা শেখ আবদুল্লাহর মতো গাদ্দারের সঙ্গে যোগ দিয়ে কাশ্মিরের স্বাধীনতা আন্দোলনকে বিপন্ন করে তুলেছে! আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, শেখ আবদুল্লাহ হিন্দুস্তানের অনুগত হয়ে গেল কেন? আমাদের নেতারা শেখ আবদুল্লাহর সঙ্গে যোগ দিল কেন? আবার নিজেরাই জবাব ঠিক করি, আসলে এরা বিশ্বাসঘাতক। এরা আপন ভাই ও নিজ জাতিকে দাস বানিয়ে দিল। শেখ আবদুল্লাহরই গাদ্দারির ফলে এখানে হত্যা ও লুটতরাজের বাজার সরগরম। আজ আমাদের ভারতের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াই করতে হচ্ছে। আপন ঘরবাড়ি ত্যাগ করে আমাদের গোপন ঠিকানা তালাশ করতে হচ্ছে।

এসব ভাবনা ও কল্পনার মধ্য দিয়ে আমরা হাঁটতে-হাঁটতে নটিপুরায় পৌঁছে যাই। আমি কোথায় এবং কার কাছে থাকি, তা আমি তাকে আগেই বলে দিয়েছিলাম। ঠিক এমন সময়ে আমরা টহল বাহিনীর নজরে পড়ে যাই। সৈন্যরা আমার সঙ্গীকে থামতে বলে। সঙ্গে-সঙ্গে সে দৌড়ে পালিয়ে যায়। দেখতে-না-দেখতে পুলিশ পুরো এলাকাটা ঘিরে ফেলে। ছেলেটি দৌড়ে আমার আস্তানায় গিয়ে পৌঁছে এবং দ্রুত পোশাক পরিবর্তন করে ঘরের লোকদের সঙ্গে মিশে যায়। পালাবার সময় তার পরনে ছিল সাদা পোশাক।

পুলিশ খুঁজতে-খুঁজতে সেই বাড়িতে ঢুকে পড়ে এবং জিজ্ঞেস করে, একটু আগে সাদা পোশাক পরা যে-ছেলেটা ঢুকেছিল, তাকে হাজির করো; অন্যথায় তোমাদের সবাইকে গুলি করে হত্যা করব। বাড়ির মালিক বললেন, কে ঢুকেছে, কার কথা বলছেন বুঝছি না। আপনারা খুঁজে দেখুন।

তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ সাদা পোশাকপরা ছেলেকে না পেয়ে আমাকে তুলে নিয়ে যায়।

ইন্টারোগেশন সেন্টারে নিয়ে গিয়ে পুলিশ আমার পাজামা খুলে ফেলে। পাজামার ফিতা খুলে তা দিয়ে আমার হাতদুটো পিঠমোড়া করে বাঁধে। চোখদুটো কাপড় দ্বারা ঢেকে দিয়ে আমাকে নিয়ে ফুটবলের মতো খেলে। আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। শুধু অনুভব করছিলাম, আমি এখন একটা ফুটবল ছাড়া আর কিছু নই। এ সময় আমার মাথাটা একাধিকবার দেওয়ালের সঙ্গে গিয়ে আঘাত খায়। আমার মুখ থেকে আর্তচিৎকার বেরিয়ে এলে ভারতীয় হায়েনারা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ত।

তারপর আমাকে বিদ্যুতের শক দেওয়া হয়। তারা আমার সঙ্গে এমন আচরণ করছিল, যেন আমি তাদের একজন প্রতিপক্ষ সৈনিক। অথচ আমি তাদের বারবারই বলছিলাম, আমি ছাত্র, দশম শ্রেণীতে লেখাপড়া করি।

'ছাত্র' কথাটা শুনে তারা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং আমার গায়ে এমন লাথি মারে যে, আঘাত খেয়ে আমি বেহুঁশ হয়ে যাই।

কিছুক্ষণ পর আমি যখন জ্ঞান ফিরে পাই, তখন দেখলাম, আমার মাথায় বন্দুকের নল তাক করে একজন বলছে, শালা ঢং করছে। এক্ষুনি

গুলি করে তোর জীবন শেষ করে ফেলব। আমি নিরুপায়ের মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি। আমার ভীষণ পিপাসা লাগে। আমি চাপা কণ্ঠে পানি চাইলাম। আমার মুখের কাপড় সরিয়ে একটা লোটা এগিয়ে ধরে একজন বলল, এই নে পানি। অন্য একজন আমার মুখের সঙ্গে লোটাটা লাগিয়ে দেয়।

আমি গলগল করে পানি পান করতে শুরু করলাম। কিন্তু পানিগুলো গরম ও নোনা। তা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। আমি বুঝলাম, এ তো পানি নয়- মানুষের প্রশ্রাব। আমি থু-থু করে মুখ সরিয়ে নিলাম। তারা আমাকে মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে আমার গায়ে এক ধরনের পাউডার ছিটিয়ে দেয়। তাতে সঙ্গে-সঙ্গে আমার সমস্ত শরীর ঝলসে যায় এবং ফোসকা পড়ে যায়। তখন আমার হাতদুটো বাঁধা। সেই পাউডারের এ্যাকশনে আমি চিরদিনের জন্য এ্যালার্জির রোগী হয়ে যাই।

সেই হিংস্র হায়েনারা আমাকে শারীরিকভাবে কষ্ট দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, আমার আত্মমর্যাদার উপরও তীব্র আঘাত করেছে। তারা আমার সামনে মুজাহিদদের অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে এবং ইসলাম নিয়ে আপত্তিকর ভাষায় কটাক্ষ করে।

পরদিন তারেক নামক অপর এক যুবকও বন্দী হয়ে আমার সেলে আসে। তার সঙ্গেও একই আচরণ করা হয়। পুলিশ যখন জানতে পারে, আমি বেগ পরিবারের সদস্য, তখন আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তারা আমাকে পাপাটু পাঠিয়ে দেয়।

পাপাটু নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা আমাকে পা ধরে টেনে-হেঁচড়ে বাইরে বের করে রাস্তায় নিয়ে যায়। রাস্তার বিক্ষিপ্ত কংকরের ঘষায় আমার কোমর-পিঠ চালনির মতো ঝাঁঝরা হয়ে যায়। পাপাটুতে আমার ওপর আরও নির্মমভাবে অত্যাচার করা হয়।

হেলাল বেগের সন্ধান দেওয়ার জন্য আমাকে প্রথমে লকাবে আবদ্ধ করে রাখে। তারপর লকাব থেকে বের করে মাথাটা নিচের দিকে ঝুলিয়ে পাদুটো উপরে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখে। এ অবস্থায় আমার শরীরে সুঁই ফুটানো হয়। মুখে গরম ভাপ দেওয়া হয়। এ শাস্তি থেকে অব্যাহিত দিয়ে পাওয়ারটাচ দেওয়ার জন্য অন্য এক কক্ষে নিয়ে যায়। পাপাটুতে আমি

যে-ধরনের টর্চার ও নির্যাতনের শিকার হই, তাতে আমার বিশ্বাস জন্ম নেয়, আমি আর বাঁচব না। কিন্তু তৃতীয় দিন হঠাৎ করে আমাকে মুক্তির বার্তা শোনানো হলো। বাড়ি এসে আমি জানতে পারি, নাজীর সিদ্দিকী পনেরো হাজার টাকার বিনিময়ে আমাকে মুক্ত করে এনেছেন।

২৪ ও ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে আমার পিতা, ছোট ভাই, দাদা ও দুই মামা শাকীল বেগ ও ফিরোজ বেগের সঙ্গে পুনরায় আমাকে গ্রেফতার করা হয়। এ সময়ে আমাদের সঙ্গে মোহাম্মাদ হুসাইন, আলতাফ খান, মোহাম্মদ সিদ্দিক সুফী, শাব্বীর আহমাদ বাট ও জাবেদ আহমাদকেও গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারের পর প্রথমে আমাদের টোটো গ্রাউন্ড বিএসএফ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে লাগাতার আট দিন যাবত আমাদের উপর চর্টার করা হয়। চোখে পট্টি ও দুহাত পিঠমোড়া করে বেঁধে আমাদের ওপর এত অত্যাচার করা হয় যে, তা ভাষায় ব্যক্ত করে বোঝানো সম্ভব নয়। কয়েক দিন পর্যন্ত আমার পাদুটো চৌকির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয় এবং বলে দেওয়া হয়, যদি একটুও নড়াচড়া কর, তাহলে পিঠে ডান্ডা পড়বে। তারপর পাপাটু নিয়ে গিয়ে আমার ওপর আরো অকথ্য ও নির্মম নির্যাতন চালানো হয়।

আন্ডারগ্রাউন্ডের সন্ধানে

ফরীদা জানান–

জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর মুদ্দাসসির দীর্ঘ এক মাস পর্যন্ত চিকিৎসাধীন থাকে। তথাপি চার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখনও তার শরীরের সুস্থতা ফিরে আসেনি। একটু কিছু হলেই তার এলার্জি দেখা দেয়। বস্তুত ভারতীয় বাহিনী তাকে পঙ্গু বানিয়ে ছেড়েছে।

একা মুদ্দাসসির-ই নয়, আমরা আমাদের অসংখ্য যুবক কর্মীকে ভারতের জেল ও ইন্টারোগশন সেন্টার থেকে মুক্ত করে এনেছি। শুধু তা-ই নয়, বন্দী থাকা অবস্থায় তাদের চিকিৎসাও করিয়েছি। এ কাজের জন্য শ্রীনগরের ছোট-বড় অনেক ডাক্তারের সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক ছিল। 'বহেনজী'র সংবাদ পাওয়ামাত্র তারা ছুটে আসতেন এবং ইন্টারোগেশন সেন্টারে গিয়ে আমাদের জখমী যুবকদের চিকিৎসা শুরু করতেন। সংশ্লিষ্ট সরকারি লোকদের আমি আগেই ম্যানেজ করে রাখতাম।

অধিকাংশ যুবককে – যাদের সরকার নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার পর কিংবা 'মাল' খেয়ে ছেড়ে দিত, তাদের কেন্দ্রীয় পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করতে হতো। পুলিশি নির্যাতনে যাদের গুপ্তাঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হতো এবং প্রশ্রাবের সমস্যা দেখা দিত, তাদেরকে ভর্তি করতে হতো এইচএস হাসপাতালে। জিজ্ঞাসাবাদে সময় অধিকাংশ যুবকের হৃদপিণ্ডে আঘাত লাগত। তাদের জন্য চিকিৎসা নেওয়া হতো সুরা মেডিকেল ইনস্টিটিউট হাসপাতালে।

আমার বাড়ি মুজাহিদদের গোপন আস্তানা-ই নয়, একটি নার্সিং হোমও ছিল বটে। সংগঠনের কোনো কর্মী অসুস্থ্য হলে কিংবা কোনো ঘটনায় আঘাত পেলে তাদের জন্য ডাক্তার-ঔষধের ব্যবস্থা করা, তাদের

দেখাশোনার জন্য অন্য কাউকে নিয়োগ করার সব দায়-দায়িত্ব আমাকেই বহন করতে হতো।

কেউ শহীদ হলে তার বাড়িতে গিয়ে খোঁজখবর নেওয়া যে, তার পরিবার স্বাচ্ছন্দ্যে চলতে পারছে কিনা, না পারলে সংগঠনের ফাণ্ড থেকে তাদের সহযোগিতার ব্যবস্থা করা, কোনো নেতা বা কর্মী দূরে কোনো জেলে বন্দী আছে, তার বাপ-ভাই বা আত্মীয়-স্বজনের তার সঙ্গে গিয়ে সাক্ষাৎ করার আর্থিক সঙ্গতি নেই, তাহলে এমন লোকদের পথখরচের ব্যবস্থা করা, কোনো শহীদের ঘরে উপার্জনক্ষম কেউ না থাকলে শহীদ পরিবারের জন্য মাসিক ভাতা চালু করে প্রতি মাসে যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাতে টাকা পৌঁছিয়ে দেওয়ার সব দায়িত্ব এই একটি প্রাণীকেই বহন করতে হতো।

আমাকে অধিকাংশ সময় নাম পরিবর্তন করে প্রদেশ ও প্রদেশের বাইরের বিভিন্ন জেলে বন্দী নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যেতে হতো। বিচারাধীন নেতা-কর্মীদের আইনী লড়াইয়ের জন্য উকিল নিয়োগ করার প্রয়োজন হতো। এ ক্ষেত্রে আমি বার এসোসিয়েশনের কথা উল্লেখ না করে পারছি না। বার এসোসিয়েশন নিঃসন্দেহে কাশ্মিরের স্বাধীনতা আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য বার এসোসিয়েশন নিজেকে ওয়াক্ফ করে দিয়েছিল।

মুজাহিদদের হেড অফিস ছিল আমার বাড়ি। ছিল মুজাহিদদের গোপন আস্তানা। কিন্তু কালক্রমে ঠিকানাটা আর গোপন রইল না। একসময়ে বাড়িটা সরকারের নজরে পড়ে গেল। আমি আমার স্বামী মকবুল জানের সঙ্গে পরামর্শ করি। বললাম, আমাদের বাড়িটা এখন সরকারের হিটলিস্টে এসে গেছে। এই ঠিকানা এখন আমাদের জন্যও নিরাপদ নয়। আমাদের আরেকটা ঠিকানা খুঁজে নেওয়া দরকার।

স্বামী আক্ষেপের সঙ্গে বললেন, তার মানে তুমি কি আমাদের এই সখের বাড়িটা বিক্রি করে ফেলতে চাও? আমি বললাম, আল্লাহর ফজলে এবং আপনার পরিশ্রমের ফলে আমাদের কোনো কিছুর অভাব নেই। আমরা এই বাড়িটা বিক্রি করে তার মূল্য দিয়ে অন্যখানে আরেকটা বাড়ি নির্মাণ করতে পারি।

মকবুল জান বললেন, আমাদের তো দুটি ছেলে আছে। তাদের জন্য এ বাড়িটা প্রয়োজন।

আমি বললাম, আমাদের ছেলে দুটি নয় – অনেক। তাদের জন্যও সরকারের দৃষ্টির আড়ালে একটি গোপন ঠিকানা প্রয়োজন।

মকবুল জান কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, সংগঠনের জন্য যদি তোমার একটি আন্ডারগ্রাউন্ড ঠিকানার একান্তই আবশ্যক হয়, তার জন্য নতুন বাড়ি নির্মাণ করতে হবে কেন? আমরা একটি তৈরি বাড়ি কিনেই তো নিতে পারি।

আমি বললাম, না রেডিমেড বাড়ি আমাদের গোপন ঠিকানা হতে পারে না। 'বাড়ি' অপেক্ষা আমার 'আন্ডারগ্রাউন্ড' বেশি প্রয়োজন। আপনি তো জানেন, সংগঠনের একজন নেতা বা কর্মী গ্রেফতার হলে সবকিছু লন্ডভণ্ড ও এলোমেলো হয়ে যায়।

মকবুল জান বললেন, তোমার বুঝ সঠিক এবং আমি তোমার মতামতকে সমর্থন করি। তুমি হেলাল আহমাদ বেগের সঙ্গে পরামর্শ করো, কোন এলাকায় আন্ডারগ্রাউন্ড প্রয়োজন। ওখানে গিয়ে আগে আমরা জমি ক্রয় করব।

মকবুল জানের অনুমতি পাওয়ার পর আমি হেলাল আহমাদ বেগকে পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করি। শুনে হেলাল বেগ বেশ আনন্দিত হলো। হেলাল আমার পরিকল্পনার ভূয়সী প্রশংসা করল এবং তখনই আমাকে বামনায় জমি ক্রয় করার পরামর্শ দিল।

স্থান নির্ধারিত হওয়ার পর আমরা বামনায় জমি ক্রয় করলাম এবং বাড়ির নকশা তৈরি করলাম। বাড়ি তৈরির উপাদান ইট-বালি-সিমেন্ট ইত্যাদি পাঠিয়ে দিলাম। অল্প সময়ের মধ্যে বাড়ি তৈরি হয়ে গেল।

এখন বাকি শুধু যে উদ্দেশ্যে বাড়িটা তৈরি করা, সেই আন্ডারগ্রাউন্ড আস্তানা। একাজে আমার পরিবারের বাইরের কাউকে কিছু জানতে দেওয়া সম্ভব নয়। আমার পরিবারের সব সদস্যের উপর আমার পূর্ণ আস্থা ছিল; এমনকি অবুঝ সায়েমা ও মাসার্‌রাতের উপরও।

বাড়ি নির্মাণকাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর যখন সকল শ্রমিক বিদায় নিয়ে যায়, তখন আমি আমার আসল কাজ শুরু করি। এবার আমার এই

বাড়িতে আন্ডারগ্রাউন্ড আস্তানা তৈরি করার পালা। তবে কাজ করতে হবে সম্পূর্ণ নিজেরা বাইরের কাউকে জানতে না দিয়ে। প্রতি রাতে বারোটার পর গ্রাউন্ড ফ্লোর তৈরি করার কাজ শুরু করি। চলে ভোর তিন-চারটা পর্যন্ত। জমি কেটে মাটি উঠানো এবং মাটি নিরাপদ স্থানে গোপনে সরিয়ে ফেলা ছিল অত্যন্ত দুরুহ ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। আবার সারা রাতের হাড়ভাঙা খাটুনির পর ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও দিনের স্বাভাবিক কাজ আঞ্জাম দিতাম। আমার স্বামী যথারীতি কারখানায় যেতেন, সন্তানরা স্কুলে যেত আর আমি রান্নাঘর সামলাবার কাজে আত্মনিয়োগ করতাম।

হেলাল আহমাদ বেগ ছাড়া আর কেউ আমাদের এই আন্ডারগ্রাউন্ড তৎপরতার খবর জানত না। হেলাল এসে মাঝে-মধ্যে কাজের অগ্রগতির খোঁজ নিত।

চার কক্ষবিশিষ্ট গ্রাউন্ড ফ্লোরের খননকাজ শেষ হওয়ার পর মেঝে ও দেওয়ালের ঢালাইয়ের কাজের জন্য আমার পিতা ইউসুফ বেগের সহযোগিতা নিলাম। সিমেন্ট ও লোহার কাজ পর্যন্ত আব্বাজান আমাদের এই পরিকল্পনা সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন না।

এক মাস পর্যন্ত রাতের ঘুম আর দিনের আরাম হারাম করার বিনিময়ে যখন আন্ডারগ্রাউন্ড প্রস্তুত হয়ে গেল, তখন ভিতরে যাওয়া আসার রাস্তা তৈরির কাজে আমার স্বামী মকবুল জান ও হেলাল বেগ কারিগরির এমন পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন যে, পরবর্তী কালে চার চারটিবার এই বাড়িতে পুলিশি হানা হলো, একাধিকবার বাড়ি ঘেরাও করেও তল্লাশি চালানো হলো; কিন্তু পুলিশ আমাদের আন্ডারগ্রাউন্ডের সন্ধান বের করতে পারেনি।

কিন্তু আমাদের অবহেলা ও দুর্ভাগ্যবশত একদিন যখন আমার এই সখের আন্ডারগ্রাউন্ড পুলিশের কাছে ফাঁস হয়ে গেল, তখন সেখান থেকে তারা বিপুল অস্ত্রশস্ত্রসহ কয়েকজন কর্মীকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল। তারপর ভারতের বড়-বড় আর্মি ইঞ্জিনিয়ার, সিবিআই ও ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর অফিসারদের ছাড়াও মিলিটারি, বর্ডার সিকুরিটি ফোর্স, সেন্ট্রাল পুলিশ ফোর্সের বড়-বড় কর্মকর্তারা পরিদর্শনে এল। দেখে তারা বিস্ময় প্রকাশ করতে বাধ্য হলো। রাতের পর রাত আরামের ঘুম হারাম করে পরিবারের লোকদের নিয়ে যে আন্ডারগ্রাউন্ড তৈরি করেছিলাম, বেশ কিছু

দিন পর্যন্ত সেটি দেখার জন্য অসংখ্য মানুষ আমার বাড়িতে আসা-যাওয়া করতে থাকল। আমার সব পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে গেল। অথচ কত আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে আমি এটি তৈরি করেছিলাম।

আমার উদ্দীপনার অবস্থা এমন ছিল যে, যেন আমি মুজাহিদদের অস্ত্র রাখার জন্য গোপন ঠিকানা তৈরি করছি না, ইবাদত করার জন্য আমি মসজিদ নির্মাণ করছি। আন্ডারগ্রাউন্ড তৈরির কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর যখন মুজাহিদদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অস্ত্রপাতি এনে সেখানে রাখা হলো, তখন আমার মনে হয়েছিল, আমি কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এইমাত্র সফলতা অর্জন করে বিজয়ের ঝাণ্ডা উড্ডীন করেছি।

অস্ত্র তো আমি তার আগেও দেখেছি। কিন্তু আমার তৈরি আস্তানায় যখন অস্ত্র এসে গেল, তখন আমি পাগলের মতো এক একটি গান, এক একটি পিস্তল ও হ্যান্ডগ্রেনেড হাতে নিয়ে চুমো খেতে শুরু করি। সেসব অস্ত্রে দেখাশোনা করার ভার একজন মুজাহিদের উপর অর্পণ করি। আমার ফ্যামিলির লোকজন ব্যতীত এই একজন মুজাহিদই আমার এই গোপন আস্তানায় যেতে পারত। অস্ত্র সরবরাহ করা, হিসাব রাখা ইত্যাদি দায়িত্ব শাব্বীর আহমাদ ভাট নামক এই মুজাহিদই পালন করত। যাবতীয় কাজ অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথেই পরিচালিত হচ্ছিল।

সাধের গোপন ঠিকানার ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ার পর আমার মনে স্বস্তি এল। পুলিশি হানা ও তল্লাশি চালনার সময় এই ঠিকানার ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতাম। কারণ, ফ্লোরটি সূক্ষ্ম কারিগরির এমন একটি নমুনা ছিল, দেখানো না হলে নিজে দেখে তার অস্তিত্ব আবিষ্কার করার সাধ্য ছিল না। এই কারিগরির জন্য হেলাল আহমাদ বেগ আমাকে একজন অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার অভিধায় ভূষিত করল। কিন্তু সত্য হলো, এই পরিকল্পনার নায়ক ছিল হেলাল নিজে আর আমরা ছিলাম শ্রমিক।

আমার ভগ্নিপতির গ্রেফতারি

কিছুদিন পর পুলিশ আমার ভগ্নিপতি পীর জাফর আহমাদকেও মুজাহিদ ভেবে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। আমাদের পরিবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিধায় তারও নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার সুযোগ ছিল না। একপর্যায়ে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, মুজাহিদ হোক বা না হোক সরকার আমাদের ফ্যামিলি ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে গ্রেফতার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

বেলারের গ্রেফতারির পর শাকীল আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গিয়েছিল। এখন বাড়িতে না আছে শাকিল, না আছে ফিরোজ। বেলালের পর জাফরের গ্রেফতারিতে ঘরে রীতিমতো মাতম শুরু হয়ে যায়। জাফরের সঙ্গে আমার ছোট বোনের ছিল দ্বিতীয় বিয়ে। তার গ্রেফতারিতে বোন নিজেকে বিধবা ভেবে মাতম শুরু করে দেয়। আমার মা-ও এই ঘটনায় বেশ মুষড়ে পড়েন। নিজের গর্ভজাত ছেলেদের গ্রেফতারিতেও তিনি এত ভাঙেননি।

জাফরের গ্রেফতারির সংবাদ শুনে যখন আমি আলুচাবাগ গিয়ে পৌঁছি, তখন সেখানে বিপুল লোকের সমাগম। এলাকাবাসী, প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজন সবাই সেখানে ভিড় জমিয়েছে। তাদের অধিকাংশ লোক আমার ছোট বোন ও মাকে সান্ত্বনা দেওয়ার পরিবর্তে তিরষ্কার করতে শুরু করে যে, তোমাদের কিসের অভাব ছিল যে, তোমরা এই ঝুঁকিপূর্ণ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছ? এখন মজা বোঝো; একে-একে বাড়ির প্রতিটি সদস্যই তো বন্দি হয়ে গেল। এক নিকটাত্মীয় আমার বোনকে বলছিল, এসবই ফরীদার কর্মের ফল। ও যদি মুজাহিদদের সঙ্গ না দিত, তাহলে তোমাদের এই দশা হতো না।

বাড়ি পৌঁছে আমি আমার বোনকে বুকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করি। আমি তাকে বললাম, এই ঘটনার জন্য তোমার কান্নাকাটি করা

ঠিক হচ্ছে না। এসবই আল্লাহর ইচ্ছা। একনও তো তেমন কিছুই ঘটেনি। কেবল ধড়পাকড় হচ্ছে মাত্র। আমাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। আমরা একটি অত্যাচারী ও ধোঁকাবাজ সরকারের মোকাবেলায় সংঘাতে লিপ্ত হয়েছি। আযাদি আমাদের থেকে কোরবানি দাবি করছে। সে সময়টি আর বেশি দূরে নয়, যখন মায়ের সামনে আমাদের ছেলেদের যবাই করা হবে, স্ত্রীর সামনে স্বামীকে খুন করা হবে, স্বামীর সামনে স্ত্রীর, পিতার সামনে কন্যার, ভাইয়ের সামনে বোনের সম্ভ্রম লুণ্ঠন করা হবে। আবাল-বৃদ্ধ, শিশু-কিশোর নির্বিশেষে কাশ্মিরি মুসলমানদের হত্যা করা হবে। এসবের জন্য এখন থেকেই আমাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

উপস্থিত যেসব নারী-পুরুষ আমার বোন, মা ও পিতাকে তিরস্কার ও উত্তেজিত করছিল, আমি তাদেরকে উদ্দেশ করে বললাম–

'আমাদের জানা থাকা দরকার, আমাদেরও কারুর ঘর-আপনজন নিরাপদ থাকবে না। অদূর ভবিষ্যতে যেকোনো কাশ্মিরি মুসলিম ঘর থেকে শুধু যুবক ছেলেদেরই নয়, যুবতী মেয়েদের টেনে বের করা হবে এবং প্রকাশ্য রাজপথে জনসম্মুখে তাদের সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হবে। এই মুহূর্তে ভবিষ্যৎপানে যাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হচ্ছে না, তারা আমার কথাগুলো নোট করে রাখুন এবং বকওয়াস বন্ধ করুন।

আমার সঙ্গে কারও ব্যক্তিগত বিরোধ থাকলে তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই, পরোয়া নেই। কিন্তু আমি আপনাদের মুখ থেকে কাশ্মিরের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধী কোনো কথা শুনতে প্রস্তুত নই। আপনারা আমার যতই ঘনিষ্ঠ হন না কেন, এই সূত্রে আমি আপনাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতেও প্রস্তুত আছি।'

আমার এই বক্তব্যে পরিবেশ সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। একটু আগেও যেখানে হতাশা ও নৈরাশ্য বিরাজ করছিল, মুহূর্তের মধ্যে সেখানে আযাদির স্লোগান মুখরিত হয়ে উঠল।

সেদিনটা আমি আলুচাবাগেই অবস্থান করি। পরদিন বোনকে সঙ্গে নিয়ে নটিপুরা চলে আসি। বোনকে আমি আমার কাছেই রাখি।

বেশ কিছুদিন পর ফিরোজ সীমান্ত অতিক্রম করে ফিরে আসে এবং পুরোদমে সংগঠনের কাজ শুরু করে দেয়। পীর জাফর আহমাদের মুক্তির জন্য আমরা অনেক চেষ্টা করি। যেহেতু লোকটি মুজাহিদ ছিল না, তাই আমাদের পূর্ণ আশা ছিল, আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই তাকে বের করে আনতে পারব। কিন্তু আমাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো।

যখন এক বছরেরও বেশি সময় কেটে গেল; কিন্তু তার মুক্তির কোনো ব্যবস্থা হলো না, তখন আমরা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যক্তিকে অপহরণ করার সিদ্ধান্ত নিই। লটারিতে নাম এল ভারত সরকারের ঊর্ধ্বতন অফিসার দোরায়ে সোয়ামির। অবশেষে গ্রেফতারির ১৪ মাস পর পীর জাফর আহমাদ মুক্তিলাভ করে। পীর জাফর আহমাদ কিভাবে গ্রেফতার হলো, বন্দীদশায় কিরূপ নির্যাতনের শিকার হলো এবং কিভাবে মুক্তি পেল, শুনুন তারই জবানিতে।

মুক্তিলাভের পর পীর জাফর আহমাদ জানান–

'আমি ইসলামাবাদের বাসিন্দা। আলুচাবাগের মোহাম্মাদ ইউসুফ বেগের কন্যাকে বিয়ে করার পর স্বভাবত আমি তার পরিবারের সদস্য হয়ে যাই। কাশ্মিরে সশস্ত্র আযাদি আন্দোলন শুরু হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে কাশ্মিরি মুসলমানদের উপর নির্মম নির্যাতনের যে বিভীষিকা নেমে এল, তাতে আমি প্রভাবিত না হয়ে পারিনি। বেগ পরিবারের উপর যখন বিভীষিকা নেমে এল, তখন আমিও তা থেকে রক্ষা পাইনি।

পুলিশি হানা ও তল্লাশির সময় আমার সঙ্গে ভারতীয় পুলিশ যে-নির্মম আচরণ করে, তাতে আমি রীতিমত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ি। ক্র্যাকডাউনের সময় আমাদেরকে পশুর মতো হাঁকিয়ে কোনো খোলা জায়গার নিয়ে গিয়ে বরফশীতল কিংবা প্রচণ্ড খরতাপের মধ্যে দিনভর ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখত। সন্দেহভাজন যুবকদের আমাদের চোখের সামনে ধরে-ধরে নির্মমভাবে প্রহার করত। কাউকে আলাদা করে নিয়ে গিয়ে হত্যা করত।

গ্রেফতার করার পর কোনো-কোনো যুবককে গায়েব করে ফেলে তাদের গ্রেফতারির কথা অস্বীকার করা হতো। বাস থেকে নামিয়ে লাইনে দাঁড় করিয়ে যখন আমাদের পরিচয়পত্র চাওয়া হতো, তখন আমি ভাবতাম,

এ কেমন অত্যাচার! ভিন দেশের সৈনিকরা আমাদের পরিচয়পত্র তলব করছে! এ তো চোরের পুলিশকে শাসানোর মতো হলো। মোটকথা, পায়ে-পায়ে আমাদের উপর অত্যাচার চালানো হতো। তখন আমারও ইচ্ছে হতো, এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠি।

একদিনের ঘটনা, আমি অফিসে যাওয়ার জন্য স্টাফবাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় হঠাৎ একদল টহল পুলিশ এসে আরও কজন যুবকের সঙ্গে আমাকেও ধরে নিয়ে গেল। আমাদেরকে নিউ এয়ারপোর্টের ইন্টারোগেশন সেন্টারে নিয়ে আটক করে রাখা হলো। সেখানে লাগাতার দুঘণ্টা অত্যাচার করার পর আমাদের পাওয়ার টাচ্ দেওয়া হলো।

নিউ এয়ারপোর্টের ইন্টারোগেশন সেন্টারে অবস্থান করার দিনগুলোতে আমি দেখেছি, প্রতিদিন কয়েক ডজন যুবককে পুলিশ বিভিন্ন জায়গা থেকে ধরে সেখানে নিয়ে আসত। মুজাহিদ হতো আর না হতো বিশেষ করে দাঁড়িওয়ালা যুবকদের উপর বেশি অত্যাচার হতো। তাদের উপর এই বলে টর্চার করা হতো, তোমরা স্বীকার করে নাও, আমরা পাকিস্তানি মুজাহিদ।

পাকিস্তানি মুজাহিদকে ধরে আনতে পারলে ফোর্সকে কোম্পানির পক্ষ থেকে পুরস্কার দেওয়া হতো। অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পদোন্নতিও হয়ে যেত। এই লোভে দিনভর ঘুরে-ফিরে ডজন-ডজন যুবক গ্রেফতার করে নিয়ে যেত এবং নির্যাতনের মাধ্যমে তাদের থেকে পছন্দমতো স্বীকৃতি আদায় করে নেওয়ার চেষ্টা করত। অনেক সময় দৈবাৎ তাদের মধ্যে পাক কিংবা কাশ্মিরি মুজাহিদ পেয়েও যেত। তবে ধৃতদের মধ্যে যারা দাড়িওয়ালা হতো, তাদেরকে জীবনের তরে পঙ্গু করে ছাড়ত। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে যারা মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিত, তাদের লাশ কন্ট্রোল রুমে পাঠিয়ে দেওয়া হতো।

আমার মুখে দাড়ি ছিল না বলে আমার উপর বেশি অত্যাচার করা হয়নি। তারপরও যখন আমার দেহের উপর ভারী রোলার চালনা করা হতো, তখন আমার জীবন বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হতো। দেহ থেকে রোলার সরিয়ে নেওয়ার পর পেশাবের ছিদ্রপথে একটা সুঁই ঢুকিয়ে দেওয়া হতো, যার ফলে পেশাবের সঙ্গে রক্ত বের হতে শুরু করত। কিছুদিন পর পেশাবের আগে পুঁজ নির্গত হতে শুরু করত।

এক-একটি নির্যাতনের পর বলা হতো, আমরা তোমাকে আমাদের অফিসারের সামনে নিয়ে যাব; সেখানে তুমি নিজেকে পাক মুজাহিদ বলে স্বীকার করবে। অন্যথায় আমরা তোমাকে এর চেয়েও কঠোর শাস্তি দেব। আমি তাদের সামনে বলতাম, ঠিক আছে তা-ই হবে। কিন্তু অফিসারের সামনে গিয়ে অস্বীকার করতাম। তারপর শুরু হতো আরও কঠোর নির্যাতন। উল্লেখ্য, যদিও বলা হতো, অফিসারের সামনে স্বীকারোক্তি দিলে নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে, কিন্তু তা ছিল শুধুই প্রতারণা।

টানা তিন দিনের নির্যাতনের পর আমাদেরকে পাপাটু পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গাড়িতে তুলে নিউ এয়ারপোর্ট থেকে যখন আমাদেরকে পাপাটু নিয়ে যাওয়া হয়, তখন আমাদের এক একজনের নাম ধরে বলা হলো, অমুককে অমুক জাহাজে বসাও, অমুককে অমুক জাহাজে। আমি মনে করেছিলাম, বোদ হয় এখানে থেকে জাহাজে করে আমাদেরকে কোথাও নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু না, আমাদেরকে বিভিন্ন নম্বরের সেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। চব্বিশ বর্গফুটের এক একটি সেলে পাঁচজন করে যুবককে ঢোকানো হলো। কক্ষে কোনো জানালা ছিল না। ছিল না কোনো আলোর ব্যবস্থা। ফাঁসির আসামি হলেও এমন সংকীর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত জায়গায় একজনের বেশি লোক রাখার কথা ছিল না। তবে একদিক দিয়ে সুবিধাই হয়েছে যে, আমরা একে অপরের দুর্দশা উপলব্ধি করতে পেরেছি এবং একা থাকার কষ্ট থেকে রেহাই পেয়েছি।

ইন্টারোগেশন সেন্টারে টর্চারের সময় আমাদের গায়ে যে যখম পড়েছিল কিংবা নির্যাতনের ফলে নীল দাগ পড়ে গিয়েছিল, পেশাবের নালীতে সুঁই ঢোকানোর ফলে কিংবা গরম ইস্ত্রির ঘষার কারণে যে জ্বলন সৃষ্টি হয়েছিল, তার জন্য ঔষধ চেয়ে আমরা অকথ্য ভাষায় গালাগাল ছাড়া কিছুই পাইনি। খাওয়ার জন্য পেয়েছি বালিমাখা ভাত। দিনের বেলা একবার চায়ের নামে পান অযোগ্য তিতা গরম পানি দেওয়া হতো।

পায়খানা-পেশাবের জন্য বাইরে বেরুবার সময় চোখে পট্টি বেঁধে দুবাহু বেঁধে দেওয়া হতো। টয়লেটে সামান্য দেরি হয়ে গেলে বাইরে থেকে রশি ধরে টান দেওয়া হতো। অধিকাংশ সময় পুরোপুরি পেশাব-পায়খানা করার সুযোগই দেওয়া হতো না।

এতসব অত্যাচার-নির্যাতন আমরা এই ভেবে সহ্য করতাম যে, সাজা শেষ হওয়ার পর একসময় আমাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে। কারণ, ইন্টারোগেশনের পরীক্ষা থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছি। কিন্তু সেই অন্ধকার সংকীর্ণ স্থানে আসবার মাত্র তিন দিন পর পুনরায় আমাদেরকে ইন্টারোগেশন সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হলো।

ইন্টারোগেশন সেন্টারে নিয়ে গিয়ে আমাদেরকে লোহার শিকলে বেঁধে মাথা নিচু করে ছাদের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হলো। জ্বলন্ত সিগারেট দ্বারা শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে দাগ দেওয়া হলো। যাদের মুখে দাড়ি ছিল, দাড়িগুলো প্লাস দ্বারা ধরে টেনে ছিঁড়ে ফেলা হলো। মোমবাতির আগুন দ্বারা দাড়ি পুড়ে ফেলা হলো। গুপ্তাঙ্গে পাইপ দ্বারা পাউডার জাতীয় কী যেন ঢোকাল, যার ক্রিয়ায় সমস্ত শরীরে জ্বলন শুরু হয়ে গেল।

টানা দশ দিন পর্যন্ত আমাদের উপর এই টর্চার অব্যাহত থাকল। তারা আমাদের থেকে এই স্বীকারোক্তি আদায় করার চেষ্টা করছিল যে, আমরা পাকিস্তানি সৈনিক। সাথীরা আমার সঙ্গে পরামর্শ করল, আমরা কথাটা স্বীকার করে নিলেই তো ভালো হয়। হতে পারে, তাতে আমরা টর্চার থেকে রক্ষা পেয়ে যাব। বারামুল্লার এক স্কুল চাপরাশীকে তার বাসগৃহ থেকে তুলে আনা হয়েছিল। স্বীকারোক্তি না দেওয়ার কারণে তার পাদুটো জ্বলন্ত স্টোভের উপর রাখা হলো। জ্বলে-পুড়ে তার দুপা থেকে চর্বি গলে-গলে স্টোভের আগুনে পড়তে থাকল। অবশেষে আর সহ্য করতে না পেরে সে পুলিশের সেখানো বক্তব্য অনুযায়ী স্বীকারোক্তি দিয়ে দিল। তারপর তার পায়ের নিচ থেকে স্টোভ সরিয়ে নেওয়া হলো এবং তাকে মাটিতে শুইয়ে দেওয়া হলো। এমন ভয়ানক দৃশ্য দেখে আমি ও আমার কয়েকজন সঙ্গী শুধু মুজাহিদই নয়, আমরা পাকিস্তানি মুজাহিদ বলে স্বীকারোক্তি প্রদান করি।

এই স্বীকারোক্তিতে আমরা টর্চার থেকে তো মুক্তি পেলাম; কিন্তু দশম দিনে আমার নাক থেকে রক্ত ঝরতে শুরু করল। পেশাবে তীব্র ও অসহ্যকর জ্বালা-পোড়া শুরু হলো। সারা গায়ে আঘাত-ক্ষত তো আছেই। আমরা ডাক্তার ফরমায়েশ করলাম। ডাক্তার এলেন বটে; কিন্তু তিনি কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করে গড়ে সব রোগীকে Noveigen খেতে দেন।

সেখান থেকে বের করে আমাদেরকে সেন্ট্রাল জেলে রাখা হয়। সেন্ট্রাল গিয়ে বিপুলসংখ্যক কাশ্মিরি যুবক পেলাম। এখানে আমাদেরকে ১৫ দিন রাখা হয়।

গ্রেফতারির সময় আমার হাতের ঘড়ি, পকেটের টাকা, সোনার আংটি, পরিচয়পত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র পুলিশ নিয়ে গিয়েছিল। পরদিন সেন্ট্রাল জেলে রাখার পর যখন আমাদেরকে কোর্ট বেলওয়াল জেল অভিমুখে রওনা করা হয়, তখন আমি আমার এসব জিনিসপত্র দিতে বলি। জবাবে চড়-থাপ্পর আর গালাগাল ছাড়া কিছুই পাইনি।

কিছুদিন পর কোট বেলওয়াল জেল থেকে বের করে আমাদের চোখে পট্টি বেঁধে পুরাতন এয়ারপোর্ট নিয়ে যাওয়া হয়। এয়ারপোর্টে আমাদের জাইঙ্গা ছাড়া পরনের সব কাপড় খুলে ফেলা হয়। এখন আমাদের হাতদুটো বাঁধা, চোখে পট্টি আর সমস্ত শরীর উদোম। এমতাবস্থায় আমাদেরকে কপ্টারে করে জম্মুর উদ্দেশ্যে রওনা করা হয়। সেই কপ্টারে আসন ছিল মাত্র ১০টি। উঠানো হলো ৪০ জনকে। কর্মচারীরা বলে দেয়, জম্মু না পৌঁছা পর্যন্ত যাকে যেভাবে রেখেছি, একটুও নড়াচড়া করবি না, কারো মুখ থেকে টু শব্দটি যেন বের না হয়।

একসময় যখন কপ্টার ল্যান্ড করল, তখন আমাদের বলা হলো, এখন তোমরা জম্মুতে এসে পৌঁছেছ। কপ্টার থামার পর আমাদের লাইন দিয়ে নামানো হলো। তীব্র গরমে গোটা পরিবেশ পুড়ে যাচ্ছিল যেন। চোখবাঁধা মানুষগুলোকে তারা পশুর মতো হাঁকিয়ে নামাচ্ছিল। আমাদেরকে বুঝতে দেওয়া হয়নি, আমাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে আসামাত্র হঠাৎ আমরা শোরগোলের মতো শব্দ শুনতে পেলাম।

'ভারত মাতার জয়', 'হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ', 'পাকিস্তান মুর্দাবাদ' ইত্যাদি স্লোগানের মধ্য দিয়ে আমাদের উপর এমন মারধর শুরু হয়ে যায় যে, প্রচণ্ড খরতাপের মধ্যে উদোম শরীরে আমরা রক্তাক্ত হয়ে যাই। স্লোগান থেকে আমরা অনুমান করলাম যে, ভারতীয় জনতা পার্টি ও সিবসেনার কর্মীরা এয়ারপোর্টে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিল। শ্রীনগর এয়ারপোর্টে কপ্টারে উঠাবার আগে সম্ভবত এজন্যই আমাদেরকে উদোম করে নেওয়া হয়েছিল।

যাহোক মনভরে চরম অত্যাচার-নির্যাতন চালানোর পর সেখান থেকে আমাদেরকে কোর্ট বেলওয়াল নিয়ে যাওয়া হয়। চোখের পট্টি এবং হাতের বাঁধনও খুলে দেওয়া হয়। এখানে বিজেপি নেতা কাশ্মির পণ্ডিত ও সিবসেনার গুণ্ডাদের সঙ্গে আরও কারা যেন আমাদেরকে মারধর করতে থাকে। তারা গাড়ির টায়ারের রাবার হাতে নিয়ে পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিল। পিটিয়ে-পিটিয়ে তারা আমাদের গায়ের চামড়া ছিলে ফেলে। মারধরের একপর্যায়ে তারা রাজা নামক এক মুজাহিদকে চিনে ফেলে। তাকে উদ্দেশ্য করে বলে– 'তুমি তো এর আগেও এই জেলে এসেছিলে। এখন আবারও এসেছ। মনে হচ্ছে, তুমি ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী।'

তাকে আলাদা করে নিয়ে গিয়ে এমনভাবে প্রহার করে যে, মেঝেয় তার সঙ্গে ফুটবলের মতো আচরণ করে এবং নির্মমভাবে পিষ্ট করে। আমার ধারণা, সেই নির্যাতনেই লোকটি শহীদ হয়ে গেছে। কারণ, তারপর তাকে আমি আর দেখেনি।

কোর্ট বেলওয়াল জেলে আমাদেরকে যে কক্ষে রাখা হয়, তাতে বড়জোর দশজন লোক থাকতে পারে। কিন্তু রাখা হলো আমাদের ৪০ জনকে। প্রচণ্ড গরমে আগুন ঝরছিল যেন। আলোর কোনো ব্যবস্থা ছিল না। খাবার রীতিমতো দেওয়া হতো। আমরা আসামী ৬৫০ জন। তরকারির জন্য আনা হলো সাত কেজি বেগুন। ভাতের সঙ্গে একটুখানি করে বেগুনের ভর্তা দেওয়া হলো। ভাতের সঙ্গে এত পাথর যে, চাপ দিলেই কড়মড় করে উঠত। ভাত দেওয়া হতো জনপ্রতি ৫০-৬০ গ্রাম চালের। চা এক কাপ করে পেতাম বটে; তবে তাতে দুধের চিহ্নও থাকত না। চিনির পরিবর্তে দেওয়া হতো সেকারিন, তাও পরিমাণে সামান্য।

সরকার কয়েদীদের জন্য মাথাপিছু যে অর্থ বরাদ্দ দিয়েছে, বড়জোর তার দশ ভাগের এক ভাগ কয়েদীদের ভাগ্যে জোটে। জেলকর্মকর্তা ও আমলারা কয়েদীদের ফান্ড লুটেপুটে খেয়ে ফেলে। আমরা প্রতিবাদ জানালে জেলকর্মকর্তা পরিষ্কার বললেন, এসব অর্থ ভাগ হয়ে মন্ত্রী পর্যায়ে পৌঁছে যায়। অতএব তোমাদের হৈচৈ করে লাভ হবে না।

আমাদের সঙ্গীদের কয়েকজন যুবক খাওয়ার অযোগ্য ও স্বল্প খাবারের প্রতিবাদে অনশন করার সিদ্ধান্ত নেয়। তার শাস্তিস্বরূপ কর্মকর্তারা আমাদেরকে আবার ইন্টারোগেশনের জন্য নিয়ে যায়। আমরা বললাম, এ পর্যন্ত আমাদের তিনবার ইন্টারোগেশন হয়েছে। আপনারা তার এনওসিও

পেয়েছেন। জবাবে তারা বলল, এখানে আইন চলে আমাদের। তোমরা বেশি কথা বলছ; এখন তার মজা নাও।

ইন্টারোগেশন সেলে নিয়ে গিয়ে কোনো কথা জিজ্ঞেস না করেই আমাদেরকে উলঙ্গ করে ছয়জনকে একত্রে বেঁধে ফেলে। তারপর বন্দুকের বাঁট দ্বারা আমাদের পেটাতে শুরু করে। কিল-ঘুষি-লাথিও শুরু হয়ে যায় সমানতালে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদেরকে এভাবে বেঁধে রাখে। সন্ধ্যার সময় আমাদের কাপড় পরতে বলে। তারপর গাড়িতে বসিয়ে জম্মু সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেয়।

পরে আমরা জানতে পারলাম, সেদিন এক মন্ত্রী জেল পরিদর্শনে এসেছিলেন। ফলে তাকে দেখানোর জন্য জেলের ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত লোক সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। আমরা আরও জানতে পেরেছি, সেদিন কয়েকীদের শুধু নতুন পোশাকই পরতে দেওয়া হয়নি; বরং চারপাইতে নতুন চাদরও বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তবে মন্ত্রীর চলে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে চারপাই থেকে চাদরগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছিল।

মন্ত্রীকে বিভিন্ন সেলে পড়ে থাকা কয়েদীদের ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি এবং তাদেরকে দেখানোও হয়নি। এখানে কিছুদিন রাখার পর আমাদেরকে অধমপুর জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

অধমপুর জেল থেকে বের করে রাজ্যের বাইরে অন্য কোনো জেলে স্থানান্তর করার জন্য আমাদেরকে এয়ারপোর্ট পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়। এখানে দিনভর অপেক্ষা করার পর আমাদেরকে এই বলে ফিরিয়ে নেওয়া হয় যে, বিমান পাওয়া যায়নি।

পরদিন চারটার সময় আমাদেরকে পুনরায় এয়ারপোর্ট নিয়ে যাওয়া হয়। বিমানের জন্য অপেক্ষা করার সময় এয়ারফোর্সের এক শিখ অফিসার জেল অফিসারকে বলল, এই কয়েদী লোকগুলো গতকাল থেকে না খেয়ে। এদের প্রত্যেককে দুটি করে রুটি খেতে দাও। এদের বিমান কখন আসবে ঠিক নেই। জেল অফিসার – যিনি আমাদের সঙ্গে ডিউটিরত ছিলেন – বললেন, প্রয়োজন নেই, কারণ, এরা সবাই মুজাহিদ। এরা কাশ্মিরে চরম অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

এক সময় বিমান এল। তাতে উঠিয়ে আমাদের হরিয়ানা নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে বিমান থেকে আমাদের নামানো হলো। সম্ভব সেটি ছিল

আর্মি এয়ারপোর্ট। এখানে আমাদেরকে বাসে করে হরিয়ানা থেকে নয় কিলোমিটার দূরে এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা যে বাসে করে পথ অতিক্রম করছিলাম, তার সামনে ছিল সাইরেন গাড়ি। সামনে-পিছনে সিকিউরিটি গার্ড।

বাসে সিকিউরিটি গার্ড কাশ্মিরি মুজাহিদদের সঙ্গে পাকিস্তানকেও মন্দ-শক্ত বলতে শুরু করে। বিষয়টি আমরা সহ্য করে নেওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু যখন তারা মুসলমান-মুজাহিদদের সঙ্গে ইসলামেরও বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করে, তখন আর আমরা ধৈর্য ধরে রাখতে পারলাম না। আমরা প্রতিবাদ জানালাম। তার ফল পেলাম সঙ্গে-সঙ্গে। সম্ভবত তারা আমাদের মুখ খোলার অপেক্ষায়ই ছিল। বাসের সিটে বসা অবস্থায়ই তারা আমাদের পিটাতে শুরু করল। সেই মারপিট চলল ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত।

হরিয়ানা শার্শা জেলের বিভিন্ন সেলে ঢোকাবার আগে পাজামা আর আন্ডারওয়ার ছাড়া আমাদের পরনের সমস্ত পোশাক খুলে ফেলল। পাজামাও পরতে দেওয়া হয় ফিতা ছাড়া। আমরা গিরা দিয়ে পাজামা বেঁধে রাখি। এখানে আমাদেরকে আলাদা আলাদা ডেথ সেলে রাখা হয়। ৩*৬ ফুট-এর এক একটি সেলে চারজন করে কয়েদী রাখা হয়।

আমরা প্রায় সকল কয়েদীই আহত ছিলাম। হাড়-জোড়ার ব্যথা ছিল প্রত্যেকের। কারও জখম থেকে রস নির্গত হচ্ছিল, কারো পুঁজ। ডাক্তার প্রার্থনা করলে ডাক্তার এলেন। কিন্তু গড়পড়তা সবাইকে Calpal খেতে দিলেন। আমাদের সঙ্গে তারেক আহমাদ নামক এক যুবক ছিল। ছেলেটা ব্লাড ক্যান্সারের রোগী। নাজির আহমাদ বাট নামক আরেক যুবকের বাহুতে দুটি গুলী বিদ্ধ হয়েছিল। তার জন্যও কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না। আমাদের দাবি সত্ত্বেও তাদের জন্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হলো না। কর্মকর্তারা বারবার এই বলে পাশ কেটে যায় যে, তাদের জন্য আমরা সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছি। অবশেষে নাজির আহমাদ বাটের ক্ষতস্থান থেকে যখন পোকা বের হতে শুরু করল, তখন আমরা অনশন পালন করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমাদের চাপে পড়ে নাজীর আহমাদ বাটকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হলো।

এই জেলে আমার আট মাসেরও অধিক সময় কেটে যায়। একদিন রাত দুটার সময় সিবিআই'র দুজন কর্মকর্তা জেল কর্মকর্তাদের সঙ্গে

সাক্ষাৎ করতে এলেন। তারা পীর জাফর আহমাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আমাকে তাদের সামনে উপস্থিত করা হলো।

আমাকে বলা হলো, শ্রীনগর এখওয়ানুল মুসলিমীন দোরায়ে সোয়ামী নামক এক বুরোক্রেটকে অপহরণ করেছে। তারা বিনিময়ে পীর জাফর আহমদের মুক্তি দাবি করেছে। আজকালের মধ্যে তোমাকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হবে। তুমি প্রস্তুত থাকো।

পরদিনই সিবিআই ও পুলিশের কয়েকজন কর্মকর্তা এসে আমাকে সেল থেকে বের করে নিয়ে যান। আমার পরনের পাজামা খুলে তা দ্বারা আমার মাথাটা ঢেকে দেওয়া হয় এবং একটি কক্ষে নিয়ে গিয়ে আমাকে টর্চার করা হয়। সেই টর্চার ছিল এত প্রচণ্ড যে, আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। আমার নাক ও কান থেকে রক্ত বের হয়ে জমাট বেঁধে যায়। একসময়ে আমার জ্ঞান ফিরে এলে আমি দেখলাম, কক্ষে ২০/২৫ জন অফিসার বসে আছেন। তারা আমাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তোলেন।

এক অফিসার আমাকে জিজ্ঞেস করেন, দোরায়ে সোয়ামীকে অপহরণ করে কোথায় রেখেছিস বল। আমি বললাম, আমি আজ চৌদ্দ মাস হলো আপনাদের হাতে বন্দী, আমি কি করে বলব দোরায়ে সোওয়ামীকে কারা অপহরণ করেছে, কোথায়ইবা রেখেছে? আমার এই অস্বীকৃতির ফলে আমাকে আবার মারধর করা হলো।

পরদিন সকালে আমাকে জীপের মতো একটি বাহনে উঠিয়ে হরিয়ানা পুলিশ স্টেশনে পৌঁছিয়ে সেখানকার দায়িত্বশীল কর্মকর্তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। সেখানে সারারাত আমাকে অন্ধকার এক প্রকোষ্ঠে রাখা হয়। এই সময়ের মধ্যে আমাকে এক তিল খাবার, এক ফোঁটা পানিও দেওয়া হয়নি। তার পরদিন একটি জীপে করে আমাকে এয়ারপোর্ট নিয়ে যাওয়া হয়। জীপে বসিয়ে আমার উভয় বাহু হাতকড়া দিয়ে বেঁধে ফেলা হয়। আমার সঙ্গে যে সিপাহী বসা ছিল, সমগ্র পথে সে বসে বসে আমার গায়ে সুঁই ফুটাতে থাকে। লাথি ও চড়থাপ্পড় মারতে থাকে এবং কাশ্মিরি মুজাহিদদের নাম উল্লেখ করে করে গালাগাল করতে থাকে।

এয়ারপোর্ট পৌঁছার পর আমাকে একটা কপ্টারে উঠানো হলো। কপ্টারে দুজন অফিসারের সঙ্গে আমি একা। বাদামীবাগ পৌঁছিয়ে আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আমার মুক্তির পর জনতা ডাউন টাউনে আমাকে সংবর্ধনা প্রদান করে।

দোরায়ে সোয়ামীর অপহরণ

মুজাহিদরা ভারতীয় গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম অফিসার দোরায়ে সোয়ামীর অপহরণ ঘটনার দায়িত্ব স্বীকার করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার বাড়ি টার্গেটে পরিণত হয়। মুহূর্তের মধ্যে ১০/১২টি আর্মি গাড়ি এসে পড়ে। তাদের সঙ্গে সাজোয়াযান ও ওয়ারলেস সজ্জিত জীপ গাড়ি। আমার ঘরের প্রতিটি কোণে তন্নতন্ন করে তল্লাশি চালানো হয়। স্বামী মকবুল জান, পুত্র মুদ্দাসসির ও মাসাররাতের উপর নির্যাতন চালায়। মুদ্দাসসিরের ঘাড়ে বন্দুকের হাতল দ্বারা এত জোরে আঘাত করে যে, ছেলেটা নিচে পড়ে গিয়ে ছটফট করতে থাকে। মকবুল জানকে ধাক্কা মেরে শুইয়ে দিয়ে চারজন জওয়ান তার পিঠের উপর চড়ে বসে। প্রবল চাপে তার বমি হয়ে যায়। মাসাররাতের ডান বাহুটা এমনভাবে মোচড় দেয় যে, ছেলেটা চিৎকার করতে শুরু করে।

নির্যাতনের এই ধারা আমি চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। কিন্তু আমার নড়াচড়া করারও অনুমতি ছিল না। আর্মিরা আমাদেরকে হেলাল বেগ ও দোরায়ে সোয়ামী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছিল। ব্যাপক অনুসন্ধান করেও যখন তারা এখানে কিছু পেল না, তখন মকবুল জান ও মুদ্দাসসিরকে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলে। সৈন্যরা তাদেরকে ধরে নিয়ে গাড়িতে তুলতে শুরু করে।

আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। আমি তাকবীর ধ্বনি তুলে বেষ্টনী ভেঙ্গে ফেলি এবং দৌড়ে মকবুল জান ও মুদ্দাসিরের নিকট চলে যাই। আমি তাদেরকে আর্মির গাড়িতে ওঠা থেকে ঠেকিয়ে রাখি। সেই সঙ্গে আমার বোনও বাড়ির উপর তলায় উঠে জানালা দিয়ে চিৎকার জুড়ে দেয়। তার চিৎকারের আওয়াজ নটিপুরা আযাদ বস্তি ও দেলসুজ কলোনী পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

বোন এই বলে আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করছিল–

"হে আল্লাহ! তুমি আমাদের আকুতি শোনো। দেখো, মালাউনরা আমাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করছে। ওরা আমাদের ঘরের সব পুরুষকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা অসহায় হয়ে পড়েছি। ইয়া আল্লাহ! তুমি আমাদের রক্ষা করো।"

আমি মকবুল জান ও মুদ্দাসসিরকে বাহু দ্বারা জড়িয়ে ধরে আর্মি অফিসারকে বললাম, "তোমরা হয় আমাদেরকেও তুলে নিয়ে যাও, অন্যথায় এদের ছেড়ে দাও। তৃতীয় কিছু আমি তোমাদের করতে দেব না।"

আমার কথার জবাবে অয়িসার কিছু বলার আগেই এক সিপাহী এগিয়ে এসে আমার মাথার চুল ধরে টান দেয়। আমি তার গালে কষে একটা চড় বসিয়ে দেই। দুজনের মধ্যে টানা-হেঁচড়া শুরু হয়ে যায়। সিপাহী আমাকে ধাক্কা মেরে পেছনে সরিয়ে দেয় আর আমি নিজেকে সামলে নিয়ে দৌড়ে তার নিকটে এসে একটা ঘা বসিয়ে দেই।

একপর্যায়ে এক সিপাহী আমার সঙ্গে বেশি বাড়াবাড়ি করতে শুরু করলে আমি আহত বাঘিনীর মতো তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমি তার মুখে নখের আচড় কেটে ধাক্কা মেরে ফেলে দিই। লোকটি নিজেকে সামলে নেওয়ার আগেই আমি তার হাত থেকে রাইফেলটা কেড়ে নিই। আমার হাতে এখন রাইফেল। সামনে শত্রু। আমি চরমভাবে ক্ষুব্ধ। রাগের বসে গুলী করে বসি কিনা সেই ভয়ে অফিসার আমাকে শান্ত হতে বলল।

অফিসার আমার থেকে রাইফেলটি ফেরত চায়। আমি দিয়ে দেই। সাথে সাথে বলেও দিই যে, আমার জীবন নিয়েই তবে আপনি এদেরকে নিয়ে যেতে পারবেন; অন্যথায় নয়। আপনি আমাদের সবাইকে গুলী করে মেরে ফেলুন। আমরা বেঁচে থাকতে চাই না। এই জীবন থেকে মৃত্যুই ভালো। কিন্তু মনে রাখবেন, যে নির্মমতা আপনারা আমাদের উপর চালিয়ে যাচ্ছেন, তার আগুনে একদিন আপনাদের পুড়ে মরতেই হবে। আপনাদের প্রত্যেকের ঘর-সংসার একদিন তছনছ হয়ে যাবে। আমাদের স্ত্রী-সন্তানরাও আমাদের ন্যায় ছটফট, হাহুতাশ করবে। আমাদের আর্তচিৎকার আপনাদেরকে অশান্তির অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত করবে।

আমার বদ দোয়া আর আমার বোনের আর্তচিৎকারে আর্মি অফিসার হতভম্ব ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। সে মকবুল জান ও মুদ্দাসসিরকে ছেড়ে দিয়ে কোম্পানিকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। তবে যাওয়ার সময় মকবুল জানের বুকে কিল-ঘুষির বৃষ্টিবর্ষণ করে যায় এবং মুদ্দাসসিরকে তুলে পার্শ্বের দেওয়ালের গায়ে ছুড়ে মারে। আমি বাপ-বেটা দুজনকে আর্মিদের কবল থেকে ছিনিয়ে আনি। মকবুল জান ও মুদ্দাসসির কয়েক দিন পর্যন্ত চিকিৎসাধীন থাকেন। তাদের দুজনকে ডাক্তার বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দেন।

এ ঘটনার পর আমি তাদের দুজনকে আর ঘরে থাকতে দিলাম না, যাতে তাদের আর জালেমদের নির্যাতনের শিকার হতে না হয়। সন্ধ্যার পর রাতের খানা খাইয়ে আমি তাদের এক প্রতিবেশীর বাড়িতে পাঠিয়ে দিতাম। কয়েকদিন পর্যন্ত যখন আর হানা হলো না, তখন একদিন সন্ধ্যায় আমি তাদের বললাম, বাড়িতে হামলা-তল্লাশি আপাতত বন্ধ হয়েছে মনে হচ্ছে, কাজেই তোমরা আজ থেকে ঘরেই থাকো।

আমার কথা অনুযায়ী তারা সেদিন ঘরেই থেকে যায়। সেদিন আমার মনটাও ভাল ছিল না। বিশেষ করে সেজন্যই আমি স্বামী-পুত্রকে রেখে দিলাম। প্রচণ্ড মাথাব্যথায় আমার ঘুম আসছিল না। ঘরের সব মানুষ ঘুমে অচেতন। আমি তাকিয়ার সঙ্গে হেলান দিয়ে বসে আছি। রাত একটার সময় হঠাৎ আমার মুখের উপর টর্চ লাইটের আলো পড়ে। আমি হন্তদন্ত হয়ে উঠে পড়ি। ফোর্সের এক সিপাহী প্রচণ্ডভাবে দরজা নক করে বলল, 'দরজা খোল'।

উঠে দরজা খোলার আগে আমি মকবুল জান, মুদ্দাসসির, মাসাররাত ও সায়েমাকে জাগিয়ে তুলি। এ ব্যাপারে আমার ঘরের সবাই প্রশিক্ষিত। রাতে সামান্য ইঙ্গিত পেলেই ছোট-বড় সবাই জেগে উঠে মুহূর্ত মধ্যে সতর্ক হয়ে যায়।

আমার আফসোস হলো, কেন আজ আমি মকবুল জান ও মুদ্দাসসিরকে আটকে রাখলাম। অবশ্য আমি নিজেকে সামলে নিয়ে তাদের বলে দিলাম, তোমাদের ভয় পাওয়ার কারণ নেই। আমাদের পরিস্থিতির মোকাবেলা করেই চলতে হবে।

ইতিমধ্যে ঘরের দরজা ভাঙ্গার কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে। আমি দ্রুত ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে কয়েকজন সিপাহী ভেতরে ঢুকে পড়ে; একজন আমার বুকে ঘুষি মেরে ফেলে দেয়। আমি নিজেকে সামলে নিতে না নিতেই স্বামী ও পুত্রদের উপর কিল-ঘুষি-লাথি শুরু হয়ে যায়। আমার কোমর ও পিঠে লাথি পড়ে। তারা আমাদেরকে হেলাল আহমাদ বেগ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিল।

কথা জিজ্ঞেস করে সময় দিলে না হয় জবাব দিতাম। কিন্তু মদপান করে লোকগুলো এমন মাতাল হয়ে এসেছে যে, জবাব শোনার পরিবর্তে আমাদের উপর অত্যাচার শুরু করে দেয়। তাদের বক্তব্য হলো, তোরা দরজা খুলতে দেরি করেছিস। ফাঁকে তোরা হেলাল আহমাদ বেগকে লুকিয়ে ফেলেছিস। আমরা বললাম, লুকিয়েই যদি থাকি এ ঘরেই লুকিয়েছি, তোমরা খুঁজে দেখো।

এলোপাতাড়ি মারপিটের ফরে আমার স্বামীর রক্তবমি শুরু হয়ে যায়। এক অফিসার তার অবস্থা দেখে আমাকে পানি পান করাতে বলে।

আমি মকবুল জানকে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিই। অফিসার আমাকে জিজ্ঞেস করে, হেলাল বেগ কোথায়?

—আমরা জানি না।

—তোরা সবই জানিস।

—আপনি আমাদের সমস্ত ঘর তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখুন। থাকলে নিযে যান।

—তা তো দেখব। কিন্তু যদি এখানে না পাই, তাহলে কোথায় আছে তোদের বলতে হবে।

—কোথায় আছে জানি না যখন, বলব কী করে?

—এই এখনই জানবি। রাগত স্বরে বলেই অফিসার সিপাহীদের ঘরে তল্লাশি চালানোর নির্দেশ দেয়।

ভোর চারটা পর্যন্ত তারা আমার ঘরের প্রতি ইঞ্চি জায়গা তন্ন-তন্ন কর অনুসন্ধান চালায়। আলমারী, বাক্স ইত্যাদি খুলে দেখে। শেষ পর্যন্ত যখন হেলাল আহমাদ বেগকে পেল না, তখন আমার স্বামী মকবুল জানকে নিয়ে

যেতে শুরু করল। আমি মকবুল জানের সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াই এবং বলি, আমি একে নিয়ে যেতে দেব না। হয়ত তোমরা ঘরের ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সবাইকে নিয়ে যাও নতুবা কাউকে নয়।

এ সময় মকবুল জানের আবার বমি এসে যায়। তার দেহ কাঁপতে শুরু করে। অবস্থা বেগতিক দেখে অফিসার সিপাহীদের চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।

ফোর্স যে আসামীকে ধরার জন্য এসেছিল, সেই হেলাল আহমাদ বেগ তখন আমার ঘরের উপর তলায় ছিল। তারা চলে গেছে নিশ্চিত হয়ে আমি হেলালকে দেখার জন্য উপর তলায় যাই। হেলাল তার গোপন ঠিকানায় বসে সিপাহীদের চলে যাওয়ার অপেক্ষা করছিল। আমি তাকে সৈন্যদের চলে যাওয়ার সুসংবাদ শোনালাম। সে বাইরে বেরিয়ে এল এবং আমার সঙ্গে নিচে নেমে মকবুল জানের অবস্থা জানতে চাইল।

হেলাল বেগ আমাদের দুর্গতি দেখে অনেক আফসোস করে। বেশি অত্যাচার হয়েছে মকবুল জানের উপর। হেলাল বেগ তার কাছে ওজরখাহী করতে শুরু করে। তার কারণেই আমাদের উপর বারবার বিভীষিকা নেমে আসছে দাবি করে সে আমাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

আমার স্বামী থাকে বললেন–

"আমাদের উপর তো শুধু ধর-পাকড় আর মারপিটই চলছে। কিন্তু আমাদের সেই ভাইয়ের অবস্থা কী, যারা শত্রুর হাতে খুন হচ্ছে? তোমাকে নিরাপদ রেখে আমরা তোমার উপর অনুগ্রহ করছি না। তুমি এক ব্যক্তি নও, একটি আন্দোলন। আমরা তোমার নেপথ্যে থেকে আন্দোলনের গোড়ায় পানি ঢালছি শুধু। স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য আমরা আমাদের সবকিছুই কোরবান করে দিয়েছি। এ আন্দোলনের জন্য আমাদের জীবনও যদি চলে যায় সেটাই হবে আমাদের জন্য সবচেয়ে আনন্দের বিষয়। কাজেই তুমি যেকথা বলছ, ভবিষ্যতে তেমন কথা আর মুখে এনো না।"

মকবুল জানের কথায় আমার ঈমান, আস্থা ও সাহস বহু গুণ বেড়ে যায়। মাঝে-মধ্যে আমার মনে প্রশ্ন জাগত, পাছে আমার স্বামী-সন্তানরা এমনটা ভাবছে না তো যে, আমি যদি এই স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে মুজাহিদদের সঙ্গ না দিতাম, তাহলে আমাদের এই দুর্গতি হতো না।

আমার স্বামী উদ্দীপনামূলক কথা বলে আমার মর্যাদা রক্ষা করল। মকবুল জানের কথা শেষ হলে আমার পুত্র মুদ্দাসসির – যার বয়স তখন পনেরো বা ষোলো বছর – হেলাল বেগকে উদ্দেশ্য করে বলল–

"আপনি কখনও ভাববেন না, আপার হেফাযত করে আমরা আপনার উপর এহসান করছি। বরং আপনি যে সুযোগ আমাদেরকে দিয়েছেন, তা আমাদের উপরই আপনি অনুগ্রহ করেছেন বলতে হবে। আপনি জিহাদের ময়দানে আপনার নিজের জন্য নয়, ইসলাম ও মুসলিম জাতির জন্য লড়াই করছেন। আর আমরা সেই জাতিরই একটি অংশ। তাই আমরা এই মিশন থেকে দূরে থাকতে পারি কী করে? আমাদের জন্য আনন্দের ও গৌরবের বিষয় যে, আমরা আপনাদের সেবা করে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিতে পেরেছি।"

ছেলের ঈমান-আলোকিত ও বীরত্বপূর্ণ বক্তব্য শুনে আমি স্থির থাকতে পারলাম না। আমার মনটা আনন্দে ভরে গেছে। একটু আগে ঘটে যাওয়া বিভীষিকা ও অত্যাচার-নির্যাতনের কথা ভুলে গেলাম। 'শাবাশ আমার বাছাধন' বলে ছেলেকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে আদর করলাম।

ভোরের আলো ফোটা পর্যন্ত আমরা একত্রে বসে কাথাবার্তা বলতে থাকি। ফজর নামাযের পর এলাকার নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সবাই আমার খবরাখবর জানতে ছুটে আসে।

রাতে যখন আমাদের ঘরে হানা দিয়েছিল, সে সময়ে কোম্পনির একটি দল গোটা এলাকা ঘিরে রেখেছিল। প্রতিবেশীরা জানালার ফাঁক দিয়ে আমাদের ঘরে পরিচালিত তাণ্ডব প্রত্যক্ষ করছিল। এখন তারা আমাদের কুশল জানতে ছুটে এসেছে।

দোরায়ে সোয়ামীর অনুসন্ধানে শ্রীনগর শহরের পার্শ্ববর্তী প্রতিটি গ্রামে ক্র্যাকডাউন করে গ্রামবাসীদের উপর তাণ্ডব চালানো হয়। কিন্তু সরকার ঘটনার কোনো কিনারা করতে পারেনি।

তার উপর যখন কেন্দ্রীয় সরকারের তেল ও পেট্রোলিয়ামের কর্মচারীরা দোরায়ে সোয়ামীকে উদ্ধার করার দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করে, তখন সরকার এখওয়ানুল মুসলিমীনের সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় আসতে বাধ্য হয়।

দু পক্ষে আলাপ-আলোচনার জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যস্থতা অবলম্বন করা হয়।

হেলাল আহমাদ বেগ তখন এলাকায় ছিল না। মধ্যস্থতাকারীরা যখন এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, আমি তাদেরকে সন্তোষজনক জবাব দেইনি। এমনকি নজির সিদ্দিকীকেও হেলাল বেগের সঙ্গে দেখা করাতে রাজি হইনি। অবশেষে যখন আবদুল আহাদ গুরু আমার নিকট এল এবং দোরায়ে সোয়ামীর বিষয়ে হেলার আহমাদ বেগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেগ চাইল, তখন আমি তার আবেদনে সায় দিলাম।

ড. গুরু আমাকে তার গাড়িতে বসিয়ে নিয়ে যায়। তার সঙ্গে আরো কয়েকজন ড. ছিল। পথে স্বাধীনতা আন্দোলন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য নিজেকে ওয়াক্‌ফ করে দেওয়ার জন্য তারা আমার সাহসিকতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। পাশাপাশি কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করারও পরামর্শ দেন।

ইখওয়ানুল মুসলিমীন দোরায়ে সোয়ামীর বিনিময়ে যে কজন মুজাহিদের মুক্তি দাবি করেছিল, তাদের মধ্যে অন্যতম হলো জাবেদ আহমাদ ও জাফর আহমাদ। সরকার অন্যদের মুক্তি দিতে রাজি হলেও এ দুজনের পরিবর্তে অন্য নাম চায়। হেলাল আহমাদ বেগ এদের ব্যাপারে কোনো প্রকার আপস করতে পরিষ্কার অস্বীকার করে। ফলে বিষয়টা বেশ কদিন পর্যন্ত এভাবেই পড়ে থাকে। আলোচনাও চলতে থাকে।

ইখওয়ানের পক্ষ থেকে আর যাদের নাম দেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে আমার ছোট ভাই বেলালও ছিল। সরকার মনে করে, বেলাল বেগকে মুক্ত করানোর কাজে আমার হাত আছে। ফলে গভর্নর সাকসিনা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়, যাতে আমি আমার ভাইয়ের মুক্তির ব্যাপারে বেশি জোর না দেই। কিন্তু আমি তাকে কোনো সুযোগ দেইনি। কিন্তু তিনি মধ্যস্থতাকারীকে বললেন, আমি বহেনজীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তিনি তো বেলাল বেগের মুক্তির দাবি করছেন না।

মধ্যস্থতাকারী ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, এটা সংগঠনের সিদ্ধান্ত। বহেনজীকে আমি চিনি না। তিনি কে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার? এখনই গিয়ে আমি তার বাড়িঘর বোমা মেরে উড়িয়ে দেব। সঙ্গে-সঙ্গে গবর্নর সাকসিনা

বললেন, কেন, বহেনজীর ঘর উড়িয়ে দেওয়ার জন্য আপনার কাছে মাল-মসলা আছে কি? মধ্যস্থতাকারী 'হ্যা-না' কিছু বলার আগেই সাকসিনা বললেন, না থাকলে বলুন, আমি ব্যবস্থা করব, আপনি বোমা মেরে ঐ পেত্নীটাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিন। এ কাজের জন্য আমি আপনাকে মোটা অংকের পুরস্কারও দেব।

এ কথোপকথনের পর মধ্যস্থতাকারী সেখান থেকে সোজা আমার বাড়ি চলে এলেন এবং ক্ষুব্ধ কণ্ঠে আমাকে বললেন, আপনি কি গভর্নরের সঙ্গে বেলাল সম্পর্কে কোন কথা বলেছেন? আমি বললাম, না; তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন; কিন্তু আমি সুযোগ দেইনি। মধ্যস্থতাকারী বললেন, আমার মনে হচ্ছে, আপনার জীবন হুমকির সম্মুখীন। আমার ধারণা, আপনার বাড়িতে যেকোনো সময় বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। কাজেই আপনি স্বপরিবারে এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যান।

পরদিনই আমরা সেখান থেকে বামনার বাড়িতে চলে যাই। কথাটা এভাবেও বলা চলে যে, আমরা নটিপুরা থেকে বামনায় হিজরত করি।

আরেকটা জখম

আমার সবচেয়ে ছোট ভাই ফিরোজ প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছে তিন মাস হলো। এই তিন মাসে সে কয়েকটি অপারেশনেও অংশ নিয়েছে। সরকার তাকে গ্রেফতার করার জন্য জোর তৎপরতা শুরু করে। বেশ কবার ফোর্সকে ফাঁকি দিয়ে সে গ্রেফতার এড়াতেও সক্ষম হয়। অবশেষে দুর্ভাগ্যবশত একদিন রোজবড়শাহ পুলের কাছে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

সকালে ফিরোজ গ্রেফতার হয় আর সন্ধ্যায় একই সময় আলুচাবাগ ও নটিপুরার বাড়িতে হানা হয়। ফিরোজের অস্ত্র তুলে দেওয়ার নাম করে ফোর্স ঘরের একে একে প্রত্যেকে রক্তাক্ত করে।

ফিরোজের গ্রেফতারের সংবাদ পাওয়ামাত্র তার সমুদয় ব্যক্তিগত জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। ফোর্স যখন আমাদের কাছে কোনো অস্ত্র পেল না, তখন তারা আমার ভাই শাকিলকে আব্বা-আম্মার চোখের সামনে এমন পেটাল যে, তার উভয় বাহু জোড়া থেকে আলাদা হয়ে গেল। এ দৃশ্য দেখে আমার মা হাউমাউ করে জান্না জুড়ে দেন। সে এক হৃদয়বিদারক ও অসহনীয় দৃশ্য।

মা কাঁদছিলেন আর আমি তাকে কাঁদতে বারণ করছিলাম। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, যে ছেলেটির উপর এমন নির্যাতন চলছে, তিনি তার জন্মদায়িনী মা। আমি মাকে বলছিলাম, মা জিহাদে কাঁদতে নেই। কান্নাকাটি করলে মানুষের মধ্যে দুর্বলতা আসে। মা আমার প্রতি এমনভাবে তাকালেন, যেন আমাকে বলছিলেন– কেন, তুমি কি শাকিলের বোন নও? এসব তুমি কী বলছে? আমার নিজের কাছেও অবাক লাগছিল যে, এমন ভয়ানক ও নির্মম দৃশ্য দেখার পরও আমার চোখে পানি এল না কেন? আমি কি পাষাণ, নাকি এ আমার ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা!

যে-সময় শাকিলকে পিতামাতা ও দু-বোনের সামনে পাষাণ ভারতীয় সৈন্যরা পদতলে পিষ্ট করছিল, তার হাড়গোড় ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করছিল,

ঠিক তখন ফিরোজ সরকারের নির্যাতন সেন্টারে তার চেয়েও নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়ে আর্তচিৎকার করছিল।

আমার এক ভাই জেলখানায়, এক ভাই ইন্টারোগেশন সেন্টারে আর তৃতীয় ভাই আমাদেরই সামনে নির্মমতা সহ্য করছে! আমরা তাকে রক্ষা করতে চাইছি বটে; কিন্তু আমাদের এতটুকু নড়াচড়া করার অধিকারও নেই। অবশেষে সৈন্যরা শাকিলকে টেনে-হেঁচড়ে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। এখন ঘরে আব্বাজান ছাড়া আর কোনো পুরুষ নেই।

শাকিলকে নিয়ে যাওয়ার পর আমাদের ঘরের অবস্থা এমন থমথমে রূপ ধারণ করে, যেন ঘরে কেউ মারা গেছে আর এইমাত্র তার লাশ দাফন করতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সবাই একটি কক্ষে বসে নিঃশব্দে হাহুতাশ করছে শুধু। তখন ভয়ে পাড়া-প্রতিবেশীর কেউ আমাদের খবরও নিতে আসছে না।

সারাটা রাত আমরা না খেয়ে, না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিই। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছি না। শাকিলের সঙ্গে হায়েনাদের আচরণের কথা স্মরণ করে সবাই আফসোস করছিলাম শুধু।

আমার গ্রেফতারির কোনো ভয় ছিল না। কিন্তু গ্রেফতারকৃত যুবকদের কাশ্মিরি মুসলমান ও পাকিস্তানের সমর্থক মনে করে তাদের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়, তা দেখলে হিংস্র পশুরা পর্যন্ত আঁৎকে উঠবে। ভয়টা হলো এখানে।

পরদিন সকালে প্রতিবেশী, মহল্লাবাসী ও আত্মীয়-স্বজনদের আসা-যাওয়া শুরু হয়। এক পরিবারের তিন ছেলে এক জামাতা শত্রুর হাতে বন্দী! এ এক দুঃসহ ও যন্ত্রণাদায়ক ঘটনা। আমার খালা ও মামা এর দোষ আমার উপর চাপাতে চেষ্টা করে। কিন্তু এবার অন্য কেউ এরূপ কথা বলতে সাহস দেখায়নি। কারণ, তার জবাব আগেই জাফর আহমাদের গ্রেফতারির সময় আমার পক্ষ থেকে তারা পেয়েছিল। ভাগ্যক্রমে কেউ আমার সেই জবাবের কথা ভুলেছি।

জামাতার পরে পুত্র ফিরোজ ও শাকিলের গ্রেফতারিতে আমার পিতা বেশ আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠেন। তিনি এই বলে নিজেও কারাবরণ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন যে, আমি এখন আর বেঁচে থাকব কার জন্য...?

তিনি ঘরে উপস্থিত লোকদের উদ্দেশে বললেন–

"আমাদের এখন আর আছে কী? এই জীবন থেকে মৃত্যুই ভালো। এখন আমিও জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমার কলিজার টুকরোরা যে-পথের পথিক হয়েছে, আমিও সেপথ অবলম্বন করব। আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন, তা-ই হবে। এখন একা আমি-ই নই, নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলেরই অস্ত্র হাতে তুলে নিতে হবে। মানুষের জীবন-মৃত্যু সবই আল্লাহর হাতে। আমাদের মনে রাখতে হবে, জুলুম করা যেমন অন্যায়, জুলুম সহ্য করাও তেমনি অপরাধ। কাজেই আমাদের বাঁচবার পথ খুঁজে বের করতে হবে।"

আব্বাজানের এ বক্তব্যে আমার হিম্মত বহুগুণ বেড়ে যায়। অথচ ইতিপূর্বে উল্টো আমি তাকে সাহাস জোগাতাম।

শাকিল আহমাদ মুজাহিদ ছিল না। তাকে তুলে নেওয়া হয়েছে ফিরোজ আহমদের অস্ত্রের পরিবর্তে। আর ঘরে তল্লাশি চালিয়ে কোনো অস্ত্র বা আপত্তিজনক কিছু পাওয়া যায়নি। তাই আমাদের আশা ছিল, শাকিলকে ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু তা হলো না। সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর আমরা তার মুক্তির জন্য চেষ্টা-তদবির শুরু করে দিলাম।

আমি যখন আলুচাবাগ থেকে বামনা ফিরে আসি, তখন এখানেও বিভিন্ন স্তরের মানুষ আমাকে সান্ত্বনা দিতে আসে। এ সুযোগে আমি তাদের বললাম–

"এখনও কিছুই হয়নি। আমাদের এর চেয়েও কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা দরকার। আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জালেম ও প্রতারক দুশমন রাষ্ট্রের মোকাবেলা করছি। আমরা বৃহৎ একটা সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করছি। আমাদের আরও অনেক কিছু দেখার বাকি আছে। ভারতের গোলামি থেকে মুক্তি লাভের জন্য যেসব কুরবানির প্রয়োজন, তার জন্য আমাদের প্রত্যেককে এখন থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। আজ আমাদের পরিবারের সঙ্গে যা কিছু হচ্ছে, আগামীতে আপনারা এর চেয়ে কঠিন পরিস্থিতির শিকার হবেন। আপনাদের স্মরণ করতে হবে, এখানে খুন-খারাবি ছাড়াও লুটতরাজের বাজারও সরগরম হবে। এখানে রক্তের বন্যা

বইবে। বাড়িঘর ধ্বংস হবে। নারীর সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হবে। তবে সফলতা আমাদেরই পদচুম্বন করবে। আমরা ইনশাআল্লাহ আমাদের এই মহান লক্ষ্যে অবশ্যই কামিয়াব হব। ইতিহাস সাক্ষী, চূড়ান্ত বিজয় সবসময় সত্যেরই হয়। আমরা মৃত্যুর জন্য লড়াই করছি। কাজেই বিজয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। দুশমন তাদের সব প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে অত্যাচারের পথ বেছে নিয়েছে। জুলুমের এই নৌকা ডোবাতেই হবে। আমরা ভারতের মাথায় অপমানের তিলক এঁটে দেওয়ার কসম খেয়েছি। সেই শপথ আপনাদেরও নিতে হবে। এখানকার প্রতিটি মানুষকে চাই সে পুরুষ হোক বা নারী, শিশু হোক বা বৃদ্ধ অস্ত্র হাতে জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হতেই হবে। দুশমনকে এমন শিক্ষা দিতে হবে, যা সব অত্যাচারী শাসকের জন্য দৃষ্টান্তমূলক উপাখ্যানে পরিণত হয়।"

শাকিল আহমাদের মুক্তির জন্য আমরা কাসেম খা'র সঙ্গে যোগাযোগ করি। তিনি বিশ হাজার টাকা অগ্রিম নিয়ে নেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজ কিছুই করলেন না। হেলাল আহমাদ বেগ যখন জানতে পারে, আমরা শাকিলের মুক্তির জন্য চেষ্টা করছি, তখন সে পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে তাকে মুক্ত করে আনে। এই পঁচিশ হাজার টাকা নাজির আহমাদ সিদ্দিকীর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির ঊর্ধ্বতন অফিসার পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়। কোম্পানির অফিসার এই টাকার বিনিময়ে শাকিল আহমাদের মুক্তিকে সম্ভব বানিয়ে দেন।

নাজির সিদ্দিকীর আর্মি, বিএসএফ ও সিআরপিএফ-এর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। তিনি ফৌজ ও ফোর্সের এই তিন শাখার কমিশন এজেন্ট ছিলেন। এই সিদ্দিকীর মাধ্যমে আমরা টাকার বিনিময়ে কয়েকশ' মুজাহিদকে মুক্ত করিয়েছি। আমার পুত্র মুদ্দাসসিরকে এই নাজির সিদ্দিকীই পনেরো হাজার টাকার বিনিময়ে মাত্র তিন দিনে মুক্ত করে ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন।

নাহিদা সোজ-এর অপহরণ

শাকীল আহমাদ বেগের মুক্তিলাভের কিছুদিন পর ন্যাশনাল কনফারেন্সের পার্লামেন্ট সদস্য সাইফুদ্দীন সোজ-এর কন্যা নাহিদা সোজের অপহরণের ঘটনা ঘটে। নাহিদা সোজ হলো দ্বিতীয় মেয়ে, যাকে আযাদি আন্দোলনের অংশ হিসেবে অপহরণ করা হলো। তার আগে অপহরণ করা হয়েছিল ভারত সরকারের হোম মিনিস্টার মুফতী সাঈদের কন্যা রাবেয়াকে। রাবেয়াকে অপহরণ করেছিল লিবারেশন ফ্রন্ট। ইখওয়ানুল মুসলিমীন নাহিদা সোজের অপহরণের দায়দায়িত্ব স্বীকার করে নেয় এবং কয়েকজন বন্দী মুজাহিদের মুক্তির দাবি জানায়। এ দায়িত্ব স্বীকারের সংবাদ আমাকে বিচলিত ও সতর্ক করে তোলে।

ইখওয়ানুল মুসলিমীন যদি কোনো পুরুষকে অপহরণ করত, তাহলে আমাকে এত ভাবনায় পড়তে হতো না। একটি যুবতী মেয়ের ব্যাপার। তার যথাযথ দেখাশোনা করা আমার জন্য ফরজ হয়ে দাঁড়ায়। আমি ইখওয়ানের দায়িত্বশীলদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জিজ্ঞেস করলাম, নাহিদার দেখাশোনার জন্য তোমরা কাকে নিয়োগ করেছ? তারা আমাকে এমন চারজন মুজাহিদের নাম বলল, যাদের প্রত্যেকের উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। কিন্তু তারপরও অধিক সাবধানতার জন্য আমি আমার ছোট বোন ডেউজিকে বললাম, তুমি চব্বিশ ঘণ্টা নাহিদার দেখাশোনা করবে। কোন দিক থেকেই যেন তার কোনো অসুবিধা না হয়। তুমি সারাক্ষণ তার সাথে থাকবে, একত্রে খাবে, ঘুমাবে। এক মুহূর্তের জন্যও তুমি তার থেকে আলাদা হবে না।

আমি ডেউজিকে বিশেষভাবে বললাম, ও আমাদেরই বোন। কাজেই তার দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়দায়িত্বও আমাদের পালন করতে হবে। আমার যেহেতু আরও ব্যস্ততা আছে, সেজন্য এ কাজটা আমি তোমার উপর অর্পণ করলাম। ঘটনার একটা সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত তুমি

সারাক্ষণ ছায়ার মতো তার সঙ্গে থাকবে। তার কখন কী প্রয়োজন হয় দেখবে, ব্যবস্থা করবে। দুঃখ-দরদ উপলব্ধি করে তার মনোরঞ্জন করবে।

আমার বোন সঙ্গে-সঙ্গে প্রস্তুত হয়ে যায়। আমি একটা গাড়িতে তুলে দিয়ে তাকে গোপন ঠিকানায় রওনা করিয়ে দিই।

[এ পর্যায়ে কাহিনী লিপিবদ্ধকারী সাংবাদিক শাওকিন কাশ্মিরি ফরীদা আপাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, কিছুক্ষণের জন্য আপনি অবসর নিন। আমি ডেউজির সঙ্গে কথা বলতে চাই। ফরীদা আপা উঠে চলে গেলেন, ডেইজি এলেন। এবারের কথোপকথন ডেইজির সঙ্গে]

'আপনি কি বলতে পারেন, অপহৃতা নাহিদা সোজকে কোথায় রাখা হয়েছিল?'

'না। কারণ, জায়গাটা ছিল আমার একেবারে অপরিচিতি। শুধু এতটুকু বলতে পারি যে, শ্রীনগর থেকে সেখান পর্যন্ত পৌঁছতে আমার সোয়া ঘণ্টা সময় ব্যয় হয়েছিল।'

'আপনি কি নাহিদাকে আগে থেকে চিনতেন?'

'না।'

'নাহিদাকে যে-ঘরে রাখা হয়েছিল, সেখানে তার সঙ্গে অন্য কেউ ছিল কি? পুরুষ বা মহিলা?'

'কামরায় সে একা ছিল। তবে এলাকার সর্বত্র মুজাহিদরা ছড়িয়ে ছিল এবং তাকে যে-ঘরে রাখা হয়েছিল, সেই ঘরে চারজন মুজাহিদ পাহারায় নিয়োজিত ছিল। ঘরে মহিলা ছিল বটে; তবে তাদেরকে নাহিদার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। আমার বোন যদি তার দেখাশোনার জন্য আমাকে না পাঠাতেন, তাহলে হয়ত সেই ঘরের কোনো মহিলা আমার স্থান দখল করে নিত। কারণ, ইখওয়ানের আমীর নাহিদার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পুরুষের পরিবর্তে কোনো মহিলার হাতে ন্যস্ত করবেন বলে আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলেন।'

'আপনি যখন প্রথমবারের মতো তার কাছে গেলেন, তখন ও আপনাকে কী বলল?'

'আমাকে দেখে সে আনন্দিত হয়েছিল বটে, কিন্তু প্রথমে তার সন্দেহ হয়েছিল আমাকেও তার মতো অপহরণ করে আনা হয়েছে। কিন্তু যখন

আমি তাকে বললাম, আমি তোমার বোন হয়ে তোমার দেখাশোনা ও সেবার জন্য এসেছি, তখন সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।'

'নাহিদা কি আপনার কাছে জানতে চেয়েছিল, আপনি কে, কোথা থেকে এসেছেন?'

'হ্যাঁ। আমি তাকে বলেছি, আমর নাম ইয়াসমীন। আমি হযরতবালের বাসিন্দা।'

'অর্থাৎ– আপনি আপনার আসল নাম-ঠিকানা বলেননি, না?'

'হ্যাঁ, তাই। আযাদির লড়াইয়ে কখনও-কখনও আসল পরিচয় গোপন করে কৌশল অবলম্বন করতে হয়।'

'নাহিদা ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল না তো?'

'না; বিলকুল নয়। তার উপর আমি তাকে সাহস জোগাই এবং নিশ্চয়তা প্রদান করি, তোমার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করা হবে না। আমি তাকে অনুভবই করতে দেইনি, ও অপহৃতা কিংবা তার কোনো ক্ষতি হতে পারে। ও নিজেও জানত, এসবই রাজনীতির মারপ্যাঁচ। তাছাড়া তার এই বিশ্বাস ছিল, তার পিতা তার মুক্তির জন্য সম্ভব সবকিছুই করবেন।'

'নাহিদা কি তার পিতার কাছে এমন কোনো বার্তা পাঠিয়েছিল, যাতে সে তাকে তাড়াতাড়ি মুক্ত করে নেওয়ার অনুরোধ করেছিল?'

'না, নাহিদা সরাসরি কোনো বার্তা পাঠায়নি। তবে তার পক্ষ থেকে ইখওয়ানের প্রচার শাখা সেই কাজ আঞ্জাম দিত।'

'নাহিদা আপনার সঙ্গে কত দিন ছিল?'

'বোধহয় ৯ দিন। এ সময়ে সে আমার বান্ধবীতে পরিণত হয়ে যায়। সে আমাকে তাকিদ দিয়ে বলেছিল, মুক্তি পাওয়ার পর আমি অবশ্যই যেন তাদের বাসায় বেড়াতে যাই এবং তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখি। আমাকে সে ফোন নম্বরও দিয়েছিল। কিন্তু আমি সৌজন্য আশ্বাস দিলেও ওয়াদা দেইনি।'

'মুক্তিলাভের পর আপনি কি কখনও তার সঙ্গে দেখা করেছেন?'

'না, আমি নিজেকে প্রকাশ করতে চাইনি, তাকে আমার আসল রূপ দেখাতে চাইনি। এমনটা করলে আমি সংগঠনের শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে

অপরাধী হতাম। আমার বড় বোন আমার উপর যে-দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, আমাকে সে পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকা আবশ্যক ছিল। নিজের ইচ্ছায় আমি না সামনে অগ্রসর হতে পারতাম, না পেছনে সরতে পারতাম। ফরীদা আমার বড় বোন বটে; কিন্তু এই পরিচয় শুধু ঘরোয়া পরিবেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আযাদির লড়াইয়ে আমি তাকে আমার কমান্ডার হিসেবে মান্য করি। সে কারণে তার নির্দেশ লংঘন করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।'

'অনেকে নারী অপহরণের বিরোধিতা করছেন, একে গর্হিত ও অন্যায় কাজ মনের করছেন। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?'

'রাবেয়া সাঈদ, নাহিদা সোজ, ক্ষেমলতা প্রমুখের অপহরণ-ঘটনা কাশ্মিরে এ-ই প্রথম। জিহাদে সবকিছু জায়েয নয় বটে, কিন্তু পরিস্থিতি নাজায়েযকেও জায়েয বানিয়ে দেয়। মুজাহিদরাও মানুষ। ভুল-ত্রুটি তাদেরও হয়। কিন্তু আমাদের তিনটি সংগঠন দুটি যুবতী মেয়ে ও একজন বয়স্কা মহিলাকে অপহরণ করে তাদেরকে সম্মানের সাথে রেখেছিল। তাদের সযত্ন রক্ষণাবেক্ষণ করেছে এবং উপহার দিয়ে মুক্তি প্রদান করেছে। রাবেয়া সাঈদ, নাহিদা সোজ ও ক্ষেমলতা প্রমুখ যেসব মুজাহিদের তত্ত্বাবধানে ছিল, তাদের সদাচার ও উন্নত চরিত্রে তারা মুগ্ধ হয়েছে। মুক্তি পাওয়ার পর তারা মুজাহিদদের আচরণ ও চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেছে। তার বিপরীতে ভারতীয় ফোর্স এ পর্যন্ত যত কুমারী ও বিবাহিতা মহিলাকে অপহরণ করে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের সঙ্গে তারা কীরূপ আচরণ করেছে, তা কারো অজানা নয়। ভারতীয় হায়েনাদের অত্যাচারে এ পর্যন্ত বেশ কজন নারী পাগল পর্যন্ত হয়ে গেছে। আত্মহত্যা করেছে অনেকজন।'

'আচ্ছা, আপনি যান; বহেনজীকে পাঠিয়ে দিন। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।'

কিছুক্ষণ পর ফরীদা চা নিয়ে এলেন। এসেই বলে উঠলেন– 'নাহিদা সোজের অপহরণ ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঘরে একের পর এক হানা পড়তে শুরু করে। এই শংকা আমার আগে থেকেই ছিল। তাই আমি, মকবুল জান ও মুদ্দাসসির আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাই। ঘরে ছিল আমার মা,

ননদ নারগিস ও কন্যা সায়েমা। ইখওয়ান যখন নাহিদা সোজ-এর অপহরণের দায়িত্ব স্বীকার করে, তখন নটিপুরা ও দেলসুজ কলোনী ঘেরাও দিয়ে আমাদের বাড়িতে হানা দেওয়া হয়। বিএসএফ-এর একটি কোম্পানি ছোট ও বড় গাড়িতে করে এসেছিল। ওয়ারলেস-সজ্জিত কয়েকটি জীপ গাড়িও তাদের সঙ্গে ছিল। এক প্লাটুন মহিলা পুলিশও ছিল। ঘেরাওয়ে বিএসএফ-এর সঙ্গে রেগুলার আর্মিও ছিল।

আমাদের ঘরে ঢুকেই মহিলা পুলিশ আমার মাকে ঝাপটে ধরে। মায়ের সঙ্গে নারগিস-সায়েমাকেও মারপিট করে। তারা তাদেরকে 'বহেনজি' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিল। তারা যখন বুঝতে পারে, এবার এরা হেলাল আহমাদ বেগ বা অন্য কোনো মুজাহিদের পরিবর্তে 'বহেনজী' ধরতে এসেছে, তখন আমার মা বললেন... ।'

আমি (কাহিনী লিপিবদ্ধকারী শাওকিন কাশ্মিরি) এখানে ফরীদাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, এ ব্যাপারে আমি আপনার মায়ের সঙ্গে কথা বলব। আপনি আবারও বিশ্রাম নিন। বহেনজীর মা পার্শ্বেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি সঙ্গে-সঙ্গে এসে বলে উঠলেন–

তারা আমাকে জিজ্ঞেস করে, বহেনজী কোথায়?

আমি বললাম, ও এখানে নেই।

জিজ্ঞেস করে, কোথায় আছে?

বললাম, তার ভাইদের সঙ্গে দেখা করার জন্য জুধপুর গেছে। তার স্বামীও তার সঙ্গে আছে। জুধপুর থেকে মধ্যপ্রদেশ যাবে। কারণ, তার এক ভাই ও ভগ্নিপতি পৃথক দুটি জেলে বন্দী।

জিজ্ঞেস করে, আপনি তার কী হন?

বললাম, আমি তার শাশুড়ি। তার মাও এখানে নেই।

কিন্তু আমার এ জবাবে তারা আশ্বস্ত হলো না। এক অফিসার মহিলা পুলিশকে ইঙ্গিতে নির্দেশ দেয়। সঙ্গে-সঙ্গে আমার পিঠে হান্টারের আঘাত পড়তে শুরু করে। আমাকে পেটাতে দেখে নারগিস ও সায়েমা চিৎকার জুড়ে দেয়। পুলিশ তাদেরকে টেনে-হেঁচড়ে দূরে সরিয়ে দেয়। আমার আশংকা হলো, দূরে সরিয়ে নিয়ে তাদেরকে আমার সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করে কিনা। তাহলে তো মুশকিল হয়ে যাবে। তাদের সত্য কথায় যখন

আমার বক্তব্য মিথ্যা প্রমাণিত হবে, তখন তো আর আমার উপায় থাকবে না।'

'আপনার আশংকা কি সত্য প্রমাণিত হলো?'

'হ্যাঁ, তাদেরকে একত্রে নয়, পৃথক পৃথক জিজ্ঞাসা করে যে, বহেনজী কোথায় এবং আমি বহেনজীর কী হই?'

'তারা কী বলল?'

'ঠিক তা, যা আমি বলেছি। আমার কথাগুলো তারা মুখস্থ করে রেখেছিল এবং মনে-মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিল, যদি প্রশ্নের সম্মুখীন হই, তাহলে একথা-ই বলতে হবে। অর্থাৎ– তারা বলে, আমি বহেনজীর শাশুড়ি এবং বেহনজী স্বামীর সঙ্গে জুধপুর গেছেন তার ভাইয়ের সঙ্গে জেলে দেখা করার জন্য।'

'আচ্ছা, সত্যি-সত্যি এত ছোট্ট মেয়েগুলো ফোর্সকে বোকা বানিয়ে ছাড়ল।'

'হ্যাঁ, আমাদের অবুঝ ছেলেমেয়েরা বড়দের বক্তব্য শোনার পর পরবর্তী সময়ে সেই অনুপাতে কথা বলতে বড় সেয়ানা। কারণ, তারা ভালো কষ্টে জানে, আমরা যদি বড়দের বক্তব্য সমর্থন না করি, তাহলে তাদের সঙ্গে আমাদেরও পিটুনি খেতে হবে। সেজন্য আমরা বড়রা যখন কথা বলি, তখন ঐ পিচ্চিরা এসে কান পেতে শোনে এবং হৃদয়ঙ্গম করে।'

'তারপর কী হলো?'

'তারপর তারা আমাদের ঘরে তন্ন-তন্ন করে তল্লাশি চালাল। ঘরের আসবাবপত্র তছনছ করে ফেলল। মহিলা পুলিশ দ্বারা আমার উপর এত নির্যাতন চালানো হলো যে, আমার দেহের প্রতিটি জোড়া ব্যথা হয়ে গেল।'

এত বিশাল ফৌজ ও ফোর্স ব্যর্থ হয়ে খালি হাতে ফিরে যেতে চাচ্ছিল না। তাদের বহেনজীকে চা-ই চাই। অবশেষে তারা আমাকে তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আমার চোখে পট্টি বেঁধে একটি গাড়িতে তুলে নেয়। নারগিসকেও আমার সঙ্গে নিয়ে যায়। পাপাটু নিয়ে গিয়ে আমাকে এক অফিসারের সামনে পেশ করা হয়।

এখানে আমার চোখ খুলে দেওয়া হয়। অফিসারকে জানানো হয়, বহেনজী ওখানে নেই, আমরা তার শাশুড়িকে তুলে এনেছি। এবার শাশুড়িকে ছাড়িয়ে নিতে বহেনজীকে আমাদের হাতে ধরা দিতেই হবে। অফিসার আমাকে নীরিক্ষা করে দেখে এবং জিজ্ঞেস করে– 'তোমার বয়স কত?

আমি বললাম, ষাট বছর।

'নাহ' বলেই সে আমার মাথা থেকে ওড়নাটা সরিয়ে নেয় এবং চুলে হাত দিয়ে বলে, 'তোমার চুল তো এখনও কালো। ষাট বছর বয়সে তো মানুষের চুল পেকে যায়।'

আমি তার একথার কোনো উত্তর দিতে পারলাম না।

অফিসার বলল, পরিষ্কার করে বল বহেনজী কোথায়?

বললাম, আমি পরিষ্কার করেই বলছি, আমার বউ জুধপুর গেছে।

অফিসার বলল, নাহিদা সোজ কোথায় আছে নিশ্চয়ই জান।

আমি বললাম, না, আমি তার কিছুই জানি না।

অফিসার বলল, হেলাল বেগের সঙ্গে তোমার নিশ্চয়ই দেখা হবে। নাহিদাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তাকে বলতে পারবে? একটা নির্দোষ মেয়েকে অপহরণ করা মানবতাপরিপন্থী কাজ। কোনো ধর্মই এ কাজের অনুমতি দেয় না। তুমি তাকে বিষয়টা বোঝাতে পার। এ দায়িত্বটা মাথায় নিলেই তোমাকে ছেড়ে দেব।

আমি অফিসারের এ বক্তব্যেরও কোনো জবাব দিলাম না। তারা ব্যর্থ হয়ে কিছুক্ষণ পর নারগিসের সঙ্গে আমাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দেয়। আমাদের রওনা হওয়ার সময় অফিসার সিপাহীদের বলে দেয়, 'বহেনজীর ঘরে তার যে ছোট ছেলেটা আছে, তাকে তুলে নিয়ে এসো।'

সন্ধ্যার সময় যখন আমাদের ঘরে রেখে আসা হয়, তখন সিপাহীরা সায়েমাকে জিজ্ঞেস করে , তুমি বহেনজীর কী হও?

সায়েমা জবাব দেয়, তিনি আমার ফুফী। আমি সুরায় থাকি। আজই এখানে এসেছি। এসে শুনলাম, ফুফীজান জুধপুর গেছেন তার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে।

'বহেনজীর ছোট ছেলেটা এখানেই আছে, না?' তারা মাসাররাতের প্রতি তাকিয়ে সায়েমাকে জিজ্ঞেস করে।

সায়েমা 'হ্যাঁ'সূচক জবাব দেয়।

পুলিশ মাসাররাতকে তুলে নিয়ে যায়। পুলিশ যখন তাকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন তার মা প্রতিবেশীর ঘর থেকে দৃশ্যটা দেখছিলেন। মাসাররাতেরও মায়ের প্রতি চোখ পড়ে। মা তার শিশুপুত্রকে ইশারায় আল্লাহ হাফেজ বলে বিদায় দেন। মাসাররাত গ্রেফতার হওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল। সিপাহীরা যখন আমাকে নিয়ে গিয়েছিল, তখনই সে বোন সায়েমাকে বলেছিল, এবার পালা আমার। আমি কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকি। সায়েমা তাকে যেতে দেয়নি। বলে, আমি একা ভয় পাব। অন্তত তুমি আমার সঙ্গে থাকো।

ঠিক এ সময় হঠাৎ করে মাসাররাত ভেতরে প্রবেশ করে। আমি (শাওকিন কাশ্মিরি) তাকে বললাম, এসো, আমার কাছে বসো। ছেলেটা আমার পাশে এসে বসলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, সিপাহীরা যখন তোমাকে তুলে নিয়ে যায়, তখন তারা তোমার সঙ্গে কেমন আচরণ করে?

জবাবে সে বলল, রাতে আমাকে পাপাটু নিয়ে যাওয়া হয়। পরদিন সকাল -সকাল গাড়িতে বসিয়ে আমাকে রাজভুব নিয়ে গবর্নর সাকসিনার সামনে পেশ করা হয়।

গবর্নর তোমাকে কী বললেন?

সম্ভবত তিনি আমাকে ছোট্ট ছেলে মনে করে অনুমান করলেন, মারপিট করে নয়, আদর-সোহাগ দিয়েই একে ঘায়েল করতে হবে। সোহাগ পেলে আমি সব কথা বলে দেব। তিনি আমাকে বিস্কুট খেতে দিলেন এবং নরম সূরে বললেন, একটি নিরীহ নির্দোষ মেয়েকে অপহরণ করা অন্যায় কাজ। তুমি ছোট, হয়ত এ কারণে তুমি ন্যায়-অন্যায় বুঝবে না। সংক্ষেপে বোঝো, কেউ যদি তোমার বোন কিংবা মাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়, তাহলে তোমার কাছে কেমন লাগবে? খারাপ লাগবে না?

বললাম, হ্যাঁ, অনেক খারাপ লাগবে। আমি খুব কান্নাকাটি করব।

গভর্নর বললেন, নাহিদার বাপ-মা অনেক পেরেশান। তারা মেয়েকে হারিয়ে কান্নাকাটি করছে। তুমি কি জান, মেয়েটাকে কোথায় রাখা আছে?

আমি বললাম, কিছু জানি না।

গভর্নর বললেন, তুমি কি একথা বোঝ যে, ওরা একটা নিরপরাধ মেয়েকে অপহরণ করে অন্যায় করেছে?

জি, এটা তো ভারী অন্যায় কাজ।

গভর্নর বললেন, তাহলে তুমি তোমার মাকে বলো, তিনি যেন নাহিদাকে ছেড়ে দেন।

আমি বললাম, কিন্তু তিনি তো এখানে নেই; আমার মামার সঙ্গে দেখা করতে বাইরে গেছেন।

গভর্নর বললেন, দেখো বাছা, মিথ্যে কথা বলো না। আমি জানি, তোমার মা এখানে এবং এই শহরেই আছেন। তুমি তার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলো– এই নাও ফোন নম্বর মিলাও।

আমি বললাম, ওখানে ফোন আছে কিনা আমার জানা নেই।

গভর্নর বললেন, কোথায়? তোমার মা যেখানে আছেন সেখানে?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

গভর্নর বললেন, কোথায় আছেন বলো।

বললাম, আমি তো আপনাকে বললামই যে, আম্মীজান মামার বাড়িতে গেছেন।

গভর্নর বললেন, দেখো, সত্য কথা না বললে কিন্তু পিটুনি খাবে। তুমি তোমার মায়ের কাছে ফোন করো। তাকে বলো, যেন হেলাল বেগের সঙ্গে কথা বলে নাহিদাকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। এটি একটি নেক কাজ। এই নেক কাজে তুমি আমাকে সাহায্য করো।

আমি বললাম, নেক কাজে আমি আপনাকে সাহায্য অবশ্যই করব। কিন্তু আমার মা যে এখানে নেই; আপনার কথাটা আমি তাকে বলি কী করে?

গভর্নর বললেন, দেখো, সত্য কথা বললে আমি তোমাকে এখনই ছেড়ে দেব, অন্যথায় নাহিদা মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত ছাড়া পাবে না। তার আমি বদলে তোমাকেই বন্দী করে রাখব। তাকে যদি খুন করা হয়, তাহলে তোমাকেও আমরা খুন করে ফেলব।

মোটকথা, কথা বের করার জন্য আমাকে সাধ্যপরিমাণ খোশামোদ করা হয়। নরম-গরম উভয় রকম আচরণ দ্বারা আমাকে ঘায়ের করার চেষ্টা করা হয়। হুমকিও দেওয়া হয়। কিন্তু সিপাহীরা যে উদ্দেশ্যে আমাকে তুলে নিয়ে গভর্নরের সামনে পেশ করে, তা পূরণ হলো না। কিংবা বলতে পারেন, আমি তা পূরণ হতে দেইনি।

তারা সম্ভবত ভুলে গিয়েছিল, যে মহিলা সম্পর্কে তারা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমার শিরায় তারই রক্ত প্রবহমান। আমি সে মহিলারই গর্ভজাত। বয়সটা শুধু কম। তারা জানে না, আমি এমন এক মহিলার কোলে লালিত-পালিত হয়েছি, যিনি জীবন দিতে পারেন, শত্রুকে তথ্য দিতে পারেন না।

যাহোক, তারপর আমাকে অজ্ঞাত একস্থানে নিয়ে গিয়ে লকাপে আটকে রাখা হয়। পরদিন রাতে আমাকে পাঁচজন অফিসারের সামনে পেশ করা হয়।

'তারা তোমাকে কী জিজ্ঞেস করল?'

'তারা আমাকে আমার মামার দোকানের ঠিকানা দিতে বললেন। আমি বললাম, মামার দোকান কোথায় আমি জানি না। কারণ, আমি কখনও তার দোকানে যাইনি।'

'তারা বলল, আচ্ছা, তার বাড়িটা দেখিয়ে দাও।'

'আমি বললাম, এই রাতে অন্ধকারে আমি তার বাড়ি খুঁজে পাব কোথায়?'

একথা বলামাত্র এক অফিসার আমার গালে কষে একটা চড় বসিয়ে দেয় এবং কর্কশ কণ্ঠে বলে, 'শয়তান কোথাকার, মামার বাড়ি চিনিস না। আমাদের ধোঁকা দিচ্ছিস?'

আমি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললাম, 'বাড়ি তো চিনি, কিন্তু এই অন্ধকার রাতে খুঁজে বের করতে পারব না বলেছি।'

'তারা বলল, আমাদের কাছে লাইট আছে।'

'আমি বললাম, ঠিক আছে চলুন।'

তারা আমাকে বিএসএফ-এর একটি কোম্পানির সঙ্গে আলুচাবাগ রওনা করিয়ে দেয়। বিএসএফ-এর এ দলটি আমাকে নিয়ে যখন

আলুচাবাগ গিয়ে পৌঁছয়, ঠিক তখনই আর্মির অপর একটি কোম্পানি অনুচাবাগে তল্লাশি চালিয়ে ফেরত যাচ্ছিল। সেনা-অফিসাররা বিএসএফ-এর সঙ্গে একটা কিশোরকে দেখে জিজ্ঞেস করে, এই ছোকড়াটাকে কোথা থেকে ধরে আনলে? নিয়ে যাচ্ছইবা কোথায়?

'তারা বলল, এটা বেগ পরিবারের সন্তান; যেনতেন বাচ্চা মনে করবেন না।'

আর্মিরা আমার মামার বাড়ি থেকে বের হলো আর বিএসএফ-এর সদস্যরা আমাকে নিয়ে প্রবেশ করল। আমি মামার ঘরটা দেখিয়ে দিলাম। তা না করে আমার উপায় ছিল না। তাছাড়া আমার প্রবল ধারণা ছিল, এ পরিস্থিতিতে মামার ঘরে কেউ নেই। আমার ধারণাই সঠিক প্রমাণিত হলো। ঘরে কাউকে পাওয়া গেল না। ঘরের দরজা-জানালা ভেঙ্গে চুরমার করা হয়েছে। মূল্যবান জিনিসপত্র কিছুই নেই। সব লুট হয়ে গেছে।

বিএসএফ মামার ঘরে কাউকে না পেয়ে প্রতিবেশী লোকদের ডেকে এনে জিজ্ঞেস করল, মোহাম্মদ ইউসুফ বেগ ও তার পরিবারের অন্য সদস্যরা কোথায়? তারা অজ্ঞতা প্রকাশ করলে বিএসএফ তাদেরকে এই বলে বেদম প্রহার করল যে, তোরা সবই জানিস; কিন্তু বলচিস না। তোরাও সন্ত্রাসী।

এখান থেকে কয়েকটি যুবককে নিরাপত্তা হেফাযতে নিয়ে যাওয়া হয়। ফিরিয়ে এনে আমাকে পুনরায় লকাপে আটকে রাখা হয়। নাহিদা সোজ-এর মুক্তির এক দিন পর আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

মাসাররাত-এর বক্তব্য শেষ হওয়ামাত্র তার নানী অর্থাৎ ফরীদার মা বলে উঠলেন, ফরীদাকে খুঁজে বের করার জন্য ফৌজ ও ফোর্সের তিনটি শাখা তৎপরতা চালায়। জায়গায়-জায়গায় হানা দিতে থাকে ও অবরোধ করে যার-তার পরিচয়পত্র চেক করতে থাকে।

তখন সরকারের টার্গেট ছিল দুটি। নাহিদা সোজ-এর নিঃশর্ত মুক্তি ও ফরীদার গ্রেফতারি। ফরীদাকে গ্রেফতার করে সরকার ইখওয়ানের কয়েকজন মুজাহিদের মুক্তি দাবি প্রত্যাহার করাতে বাধ্য করতে পারত। কিন্তু তাতে ব্যর্থ হওয়ার পর সিআরপিএফ-এর এক অফিসার নির্দেশ দিল, বহেনজীকে পাওয়া না গেলে তার মাকে তুলে নিয়ে আসো।

সঙ্গে সঙ্গে দশ-বারটা গাড়ি ও জিপে করে সশস্ত্র বাহিনী ছুটে আসে এবং আমাকে ধরে চোখে পট্টি বেঁধে টেনে-হেঁচড়ে বাইরে নিয়ে গাড়িতে তুলে নেয়। দেখে নারগিস ও সায়েমা চিৎকার জুড়ে দেয়। তাদের কান্না ও চিৎকারের শব্দ অনেক দূর পর্যন্ত আমাকে ধাওয়া করতে থাকে। গাড়িতে বসিয়ে সৈন্যরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল সে কথা আমিও জিজ্ঞেস করিনি, তারাও বলেনি। আমি মনে-মনে আল্লাহর নিকট দোয়া করতে থাকি, আল্লাহ! তুমি আমার জীবন নিয়ে যাও, দুঃখ করব না; কিন্তু আমার ইজ্জত রক্ষা করো।

কিছুক্ষণ চলার পর গাড়ি থেমে যায়। আমাকে গাড়ি থেকে নামানো হয়। তারা আমাকে পাহাড়ি পথে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করে। আমি দুপা হাঁটছি আর পড়ে যাচ্ছি। চোখে পট্টি থাকার কারণে আমাকে নিয়ে তিরস্কার করে। তারা বলা সত্ত্বেও আমি তাদের সহযোগিতা নিতে অস্বীকার করি। তাদের হাত ধরতেই আমি রাজি হইনি। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তারা আমাকে সিঁড়িতে চড়িয়ে একটি কক্ষে নিয়ে যায়। সেখানে চোখ খুলে দিয়ে আমাকে একজন অফিসারের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। সিআরপি'র কয়েকজন অফিসারও সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিল।

তারা আমাকে ফরীদা ও নাহিদা সোজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে এবং হুমকি প্রদান করে যে, আমি যদি সত্য কথা না বলি, তাহলে আমাকে মেরে ফেলা হবে। আমি ঘরে বসে ফোর্সকে যে কথা বলেছিলাম, এখানেও সেই একই কথা বলি। তারা আমাকে বক্তব্য পালটানোর জন্য চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু আমি অটল থাকি। ফলে বাধ্য হয়ে তারা আমাকে বাসায় ফিরিয়ে দিয়ে যায়।

'এই বহেনজী গেলেন কোথায়? ডাকো তো।' আমি মুদ্দাসসিরকে বললাম। মুদ্দাসসির তার মাকে ডেকে আনে। ফরীদা এসে তার অসম্পূর্ণ বক্তব্য সম্পূর্ণ করে–

সেদিন গভীর রাতে মা আমার কাছে এসে বললেন, তখন তার চেহারায় চরম বিষণ্নতা ও চোখে অশ্রু টলমল করছিল। আমি তাকে বললাম, মা! আপনি যদি বলেন, তাহলে আমি নিজে ধরা দিয়ে

মাসাররাতকে ছাড়িয়ে আনি। মা বললেন, না, এটা হতে পারে না। তুমি ধরা দেবে, আমি তা মেনে নেই কী করে!

আমি বললাম, তাহলে আপনার চোখে পনি কেন? এটা তো ভীরুতার আলামত। অথচ আমাদের সর্বাবস্থায়ই সাহস রাখতে হবে। আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমার মাসুম ছেলের কোনো অসুবিধা হবে না। দেখবেন, ও নিরাপদেই ফিরে এসেছে।

আমি মুখে তো এসব বললাম, কিন্তু ভেতর থেকে কলিজাটা চুরচুর হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আমি মাকে অনুভব করতে দেইনি, আমার মনেও অস্থিরতা কাজ করছে।

পরদিন সকাল -সকাল আমি হেলাল বেগের সঙ্গে দেখা করতে রওনা হই। আমি তাকে সাম্প্রতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে অবহিত করি। মা ও নারগিসের গ্রেফতারির পর মাসাররাতের নিরাপত্তা হেফাযতে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাও শোনাই। হেলাল অত্যন্ত দুঃখিত হয়। আমি তার ভাবান্তর দেখে বললাম–

দেখো, এমন মনে করো না যে, আমি তোমার কাছে আমার নিরপরাধ পুত্রের গ্রেফতারির অভিযোগ নিয়ে এসেছি। মনে রেখো, প্রিয় মাতৃভূমির আযাদির স্বার্থে আমার চোখের সামনে যদি আমার কলিজার টুকরাকে খণ্ড-বিখণ্ডও করে ফেলা হয়, তবুও আমি ভেঙ্গে যাওয়ার নই। এ যাবত আমার যেসব পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়েছে, তা আমাকে লোহায় পরিণত করে দিয়েছে। আমি তোমাকে যেকথাটা বলতে এসেছি, তাহলো, আমার মাসার্‌রাত অনেক কিছুই জানে। শিশু শরীর হয়ত বেশি টর্চার সহ্য করতে পারবে না। কাজেই তুমি ঠিকানা পরিবর্তন করে ফেলো। তোমাকে কোনো অবস্থাতেই জালেমদের হাতে ধরা দেওয়া যাবে না। অন্যথায় তা হবে আযাদি আন্দোলনের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। কাজেই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। তোমার এখানে আসবার আগে আমি আরও কয়েকটি পয়েন্টে সতর্ক করে এসেছি।

হেলাল আমার পরামর্শ মেনে নেয় এবং বলে, মুদ্দাসসিরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। নাহিদা সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তাকে আমি আমার সঙ্গে রাখব।

নাহিদার মুক্তির ডিমান্ডে যে মুজাহিদদের মুক্তি দেওয়ার কথা ছিল, তাদের মধ্যে বেলার ছিল অন্যতম। কিন্তু বেলালের পরিবর্তে অপর দুটি ছেলেকে ছেড়ে দেওয়া হলো। নাহিদার বিনিময়ে মোট পাঁচজন মুজাহিদকে ছাড়িয়ে আনা সম্ভব হয়।

আমার বোন ডেউজির ধারণা ছিল, ডিমান্ড অনুযায়ী ভাই বেলালও মুক্তি পেয়েছে। সে অস্থিরচিত্তে বেলালের সঙ্গে দেখা করার আশা নিয়ে আমার বাড়িতে ছুটে আসে। কিন্তু এসে বেলালকে না পেয়ে সে অত্যন্ত ব্যথিত হয়। তদুপরি যখন জানতে পারে, নাহিদার পরিবর্তে মাসাররাতকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তখন সে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। আমি তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললাম, যে যুবকরা মুক্তি পেয়েছে, তারাও তো আমাদের ভাই। তুমি তাদেরই বেলাল মনে করো। আর মাসাররাতের ঘটনা তো আমাদের জন্য নতুন কিছু নয়। তবে আমি নিশ্চিত, তাকেও ছেড়ে দেওয়া হবে।

নাহিদা সোজ-এর মুক্তির এক দিন পর আমার দশ বছর বয়সের ছেলে মাসাররাতকেও ছেড়ে দেওয়া হলো।

এগিয়ে চলছে মিশন

১৯৯১ সালের আগস্ট পর্যন্ত বামনার আন্ডারগ্রাউন্ড সম্পর্কে এখওয়ানের আমীর এবং আমার পরিবারের সদস্যদের ব্যতীত না কারো জানা ছিল, না শাব্বীর আহমাদ বাট ছাড়া অন্য কারো ভেতরে ঢোকার অনুমতি ছিল। কিন্তু তার পর থেকে ধীরে-ধীরে বাছা-বাছা মুজাহিদদের এই আন্ডারগ্রাউন্ড সম্পর্কে অবহিত করাও শুরু হয় এবং ভেতরে প্রবেশের অনুমতিও দেওয়া হয়। তবে সেখানকার অস্ত্রগুলো সম্পর্কে তাদেরও কিছু জানতে দেওয়া হয়নি। এই আন্ডারগ্রাউন্ডে অস্ত্র রাখার জন্য কিছু জায়গা আলাদা করে রাখা হয়েছিল। বাইরে থেকে অস্ত্র এনে সেখানে লুকিয়ে রাখা হতো এবং সেখান থেকে সরবরাহ করা হতো। অস্ত্রের এই আমদানি ও সরবরাহে নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল শাব্বির আহমাদ বাট-এর উপর।

জাভেদ শালাহ, আলতাফ খান ও মোহাম্মদ সিদ্দিক প্রমুখ এখন নিয়মিত এখানে আসা-যাওয়া করছে এবং এই আন্ডারগ্রাউন্ডে বসে জরুরী মিটিং করছে। আমার দায়িত্ব আপ-গ্রাউন্ডে। আন্ডারগ্রাউন্ডের কাজে আমার কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। তবে আন্ডারগ্রাউন্ড সম্পর্কে সম্যক অবগত এমন কোনো বিশিষ্ট মুজাহিদ গ্রেফতার হলে তার অধিকাংশ দায়-দায়িত্ব আমারই উপর বর্তায়। কেননা, অল্প সময়ের মধ্যে সবগুলো হাইড আউটে সংবাদ পৌঁছানো এবং সেসবের সামানপত্র স্থানান্তর করানো আমারই দায়িত্ব ছিল। যতক্ষণ না আমি নিশ্চিত হতাম, সব গোছগাছ হয়ে গেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে অস্থির থাকতে হতো। এমন পরিস্থিতিতে মুজাহিদদের প্রয়োজনাদি পূরণ করা, তাদের নির্দেশনা মোতাবেক কাজ করা এসব আমাকেই আঞ্জাম দিতে হতো। এসব করে আবার আঞ্জাম দিতে হতো নিজের পারিবারিক সব কাজকর্মও।

এতকিছু করা আমি একজন মহিলার পক্ষে দুরূহ হলেও না করে উপায় ছিল না। কখনও-কখনও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেত বটে; কিন্তু তারপরও সব সহ্য করে নিতে হতো। আমাকে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় ফেলত কিছু-কিছু মুজাহিদের খুঁটিনাটি বিষয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব।

কেউ-কেউ মুজাহিদদের ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করত। মুজাহিদদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের জন্য মূলত তারাই দায়ী। জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, শাশুড়ি-বধূর ঝগড়া, স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য ইত্যাদি ব্যাপারে প্রভাব খাটিয়ে কতিপয় মুজাহিদকে জড়িত করিয়ে তারা আযাদি আন্দোলনের যে-ক্ষতি করেছে, তার হিসাব নেই। কোনো-কোনো বন্দুকধারী অর্থের লোভে অস্ত্রের অপব্যবহার করেও আন্দোলনের অনেক ক্ষতি করেছে।

মানুষ যখন আমার নিকট অভিযোগ নিয়ে আসতে শুরু করে, অমুক 'মুজাহিদ' এটা করেছে, ওটা করেছে, ওদিকে গেছে, এদিকে এসেছে, অমুককে হুমকি দিয়েছে, অমুককে ভয় দেখিয়েছে; তো প্রত্যহ এ ধরনের অভিযোগ শুনে শুনে আমি পাগলের মতো হয়ে যেতে শুরু করি। আমাকে শুধু ইখওয়ানের সঙ্গে সম্পৃক্ত অস্ত্রের অপব্যবহারকারীদের ব্যাপারেই অভিযোগ শুনতে হতো না, অন্যান্য জিহাদি সংগঠনের অস্ত্রধারীদের অভিযোগেরও বিচার করতে হতো।

এক সংগঠনের মুজাহিদ আরেক সংগঠনের মুজাহিদদের সাইকেল নিয়ে গেছে। এ নালিশ আমার কাছে আসত। মুজাহিদদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-বিবাদ, মনোমালিন্য, বাদানুবাদ ও ভুল বোঝাবুঝি ইত্যাদির সমাধানও আমাকেই দিতে হতো। এ জাতীয় ঘটনা আমাকে সীমাহীন অস্থির করে তুলত। এসব কাজে আমার মূল্যবান সময় নষ্ট হতে শুরু করে। এসব অভিযোগ-অনুযোগে আর কান দেব না বারবার সিদ্ধান্ত নিয়েও রেহাই পেলাম না। উল্লেখ্য, ব্যক্তি ও জাগতিক স্বার্থে প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অস্ত্রের অপপ্রয়োগকারীদের – তারা যে-সংগঠনেরই হোক – আমি তাদের 'মুজাহিদ' বলি না, বলি 'বন্দুকধারী'। ওদের আমি 'মুজাহিদ' বলে বিশ্বাসই করি না। আমার মতে ওরা জিহাদ ও মুজাহিদদের জন্য কলংক।

কারণ, একজন মুজাহিদের সামনে একটি লক্ষ্য থাকে। যে-ব্যক্তি সেই লক্ষ্য থেকে সরে গেল, সে আর মুজাহিদ রইল না। এরূপ বন্দুকধারীদের আমি আমার বাড়িতে আসতে নিষেধ করে দিলাম। আমি তাদের পরিষ্কার বলে দিলাম, তোমরা 'মুজাহিদ' পরিচয় ধারণ করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছ। এখন আর তোমাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

ইখওয়ানুল মুসলিমীনের কেন্দ্রীয় আমীর হেলাল আহমাদ বেগ বিশেষ এক মিশনে সীমান্তের ওপারে রওনা হয়ে যান। তার রওনা হওয়ার পর আমার দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়। সীমান্তের ওপার থেকে কোনো খবর না আসা পর্যন্ত আমি অত্যন্ত অস্থিরতার মধ্যে কাটাই। হেলাল বেগ সংগঠনের একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে রওনা হয়েছিলেন। আল্লাহ না করুন, যদি তারা পথে ধরা পড়ে যান! হেলালের পক্ষ থেকে কোনো খবর না আসা পর্যন্ত অস্থিরতা আমাকে অক্টোপাশের মতো জড়িয়ে রাখে।

হেলাল আহমাদ বেগ-এর পনেরো দিন পর আমার ছোট ভাই ফিরোজ গ্রেফতার হয়। ফিরোজ বামনার আন্ডারগ্রাউন্ডের সব জানে। তাই সাবধানতার খাতিরে সমস্ত অস্ত্র সাময়িকের জন্য অন্যত্র সরিয়ে ফেলতে হয়। কাজটা করা হয় রাতে – অতি সতর্কতার সাথে। গোপনীয়তা রক্ষা করা হয় একশ' ভাগ। এতগুলো অস্ত্র এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নেওয়ার কাজের তত্ত্বাবধান পুরোপুরি আমাকেই করতে হয়, যাতে কোথাও কোনো সমস্যার সৃষ্টি না হয়। অস্ত্রের এ বিশাল ভাণ্ডার যাতে শত্রুর হাতে চলে না যায়, সেদিকে আমাকে পূর্ণ খেয়াল রাখতে হয়।

ইন্টারোগেশন সেন্টারে ফিরোজ সত্যিকার অর্থেই আমার ভাই বলে প্রমাণিত হয়। পুলিশ তার থেকে কোনো তথ্যই উদ্ধার করতে পারেনি। সংগঠনের অস্ত্রের গুদাম তো দূরের কথা, তার নিজের রাইফেলটার ব্যাপারেও কোনো তথ্য সে দেয়নি। কয়েক দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও যখন আমার বাড়িতে কোনো হানা হলো না, তখন আমি নিশ্চিত হলাম, ফিরোজ টর্চারের পালা অতিক্রম করে গেছে। ঘটনার এক মাস পর অস্ত্রগুলো ধীরে-ধীরে আপন ঠিকানায় ফিরিয়ে আনলাম।

অস্ত্রের ডিপো – যার মধ্যে আছে গোলা-বারুদ, মাইন ও হ্যান্ডগ্রেনেড – একস্থান থেকে অন্যস্থানে অপসারণ করা, তারপর পুনরায় পূর্বের স্থানে

নিয়ে আসা এক কঠিন কাজই বটে। কত কঠিন, তা সে-ই অনুমান করতে পারে, এর সঙ্গে যার সংশ্লিষ্টতা আছে। অবশেষে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের মীর লাসজানের পুত্র নাসরুল্লাহকে অপহরণ করে তার বিনিময়ে ফিরোজকে মুক্ত করে আনা হয়।

শেষ হয়ে গেল সব অর্জন

নটিপুরা থেকে বামনা হিজরত করার এক বছর পর ১৯৯২ সালের ২৪ ও ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে আমার বাড়িতে হানা হয়। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যা থেকেই বামনার পুরো এলাকা চারদিক থেকে ঘিরে রাখা হয়। আমরা ধারণা করেছিলাম, বরাবরের মতো ক্র্যাকডাউনের প্রস্তুতি চলছে। বিগত এক বছরে এ এলাকায় অসংখ্যবার ক্র্যাকডাউন হয়েছে। অন্যান্য ঘরের মতো আমাদের ঘরও একাধিকবার তল্লাশি নেওয়া হয়েছে। কয়েকবার শুধু আমাদের ঘরে হানা-তল্লাশি হয়েছে। ঘরের প্রতি ইঞ্চি জায়গা তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখা হয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই আমাদের আন্ডারগ্রাউন্ড বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। ফলে আমরা সবাই সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিলাম।

জাবেদ আহমাদ শালাহ অনেক দিন পর এই আজই এখানে এসেছে। তার সঙ্গে মোহাম্মাদ সিদ্দিক সুফী এবং মোহাম্মাদ হোসাইনও এসেছে। আলতাফ খান, শাব্বীর আহমাদ ও ফিরোজ পূর্ব থেকেই এখানে আছেন। তাদের ব্যতীত ঘটনাক্রমে আজ আমার পিতা ইউসুফ বেগ ও বড় ভাই শাকিল আহমাদ বেগ আমার বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন। আমরা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আছি আমি নিজে, আমার স্বামী মকবুল জান, পুত্র মুদ্দাস্‌সির, মাসার্‌রাত ও কন্যা সায়েমা।

মধ্যরাতে যখন দরজায় করাঘাত পড়ল, আমি বুঝে ফেললাম, হানা পড়ে গেছে। আমি আওয়াজ দিলাম, দাঁড়াও, কাপড় পরে নেই। ধড়মড় করে শোওয়া থেকে উঠে কাপড় পড়ার নাম করে তড়িঘড়ি করে আমি মুজাহিদদের কাপড়-চোপড়গুলো সরিয়ে ফেললাম। ঘরে মুজাহিদদের বিভিন্ন জিনসপত্র এদিক-সেদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। সেগুলো সামলালাম। বাইরে সৈন্যরা দরজায় শব্দ করছে, 'জলদি দরজা খোল্‌'।

এ মুহূর্তে আন্ডারগ্রাউন্ডে আছে জাবেদ আহমাদ শালাহ, মোহাম্মদ সিদ্দীক সুফী, শাব্বির আহমাদ বাট, আলতাফ খান, মোহাম্মদ হোসাইন ও ফিরোজ বেগ। আমার ছোট ভাই ফিরোজ বেগ আগের দিন দিনভর সমস্ত ক্লাশিনকভ ও একে-৪৭ রাইফেলগুলো খুলে পরিষ্কার করেছিল। এখনও সেগুলো পুনঃস্থাপন করা হয়নি।

আমি দরজা খুলে দিলাম। সঙ্গে-সঙ্গে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ)-এর জওয়ানরা হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভেতরে ঢুকে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করেই এলোপাতাড়ি মারপিট শুরু করে দিল। আমার বৃদ্ধ পিতা মোহাম্মাদ ইউসুফ বেগ, মকবুল জান, শাকিল আহমাদ বেগ, মুদ্দাস্‌সির ও মাসাররাত সবাইকে দোতলায় নিয়ে তাদের উপর টর্চার শুরু করে দিল। নীচতলায় আছি আমি ও কন্যা সায়েমা। উপরের পুরুষদের চিৎকারের শব্দে আমি চৈতন্য হারাবার উপক্রম হই। কিন্তু দ্রুত নিজেকে সামাল নিই। আমার পিতা কোমর ও হাঁটুর ব্যথার রোগী। মকবুল জানের শরীর তো বরাবরই অসুস্থ। একের পর এক টর্চার ও নির্যাতনে লোকটা এক প্রকার পঙ্গুই হয়ে গেছে। এদের মারপিট করায় আমার পাষাণ হৃদয় খাঁ-খাঁ করে উঠল। আমি বিএসএফ-এর এক অফিসারকে বললাম-

'আপনারা আসলে চান কী?'

তিনি বললেন, 'আমরা চাই মিলিট্যান্ট আর অস্ত্র।'

আমি বললাম, 'এখানে মিলিট্যান্ট-অস্ত্র পাবেন কোথায়?'

তিনি বললেন, 'এখনই দেখছি, কোথায় আছে।'

আমি বললাম, 'দেখুন ভালো কথা, কিন্তু এটা দেখবার কোন্ পদ্ধতি?'

তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে দেখার পদ্ধতি শিখিও না। আমরা সবই জানি। এখানে আমাদের কী করতে হবে, তা আমাদের জানা আছে। ভালোয়-ভালোয় তুমি নিজেই সব বলে দাও।'

আমি বললাম, 'আমার বলার চেয়ে বরং ভালো হবে আপনারা ঘরে তালাশ করে দেখুন।'

তিনি বললেন, 'তা তো দেখবই; সেজন্যই তো এসেছি।'

একথা বলেই তিনি সৈন্যদের নিয়ে ঘরে তল্লাশি নিতে শুরু করেন। আমাদের বললেন, জায়গা থেকে কেউ এক চুলও নড়বে না। অন্যথায় গুলি করে উড়িয়ে দেব।

উপর থেকে বড়দের আর্ত-চিৎকার আর বাচ্চাদের কান্নার শব্দে আমার কলিজা ছিঁড়ে যাচ্ছিল।

সে-সময় আমার ঘরে একস্থানে রেকের উপর পাঁচ-ছয় জোড়া বুট ছিল। সৈন্যরা বুটগুলো দেখে জিজ্ঞেস করল, এত বুট কেন? এগুলো যাদের, তারা কোথায়? আমি বললাম, এগুলো আমার পরিবারের সদস্যদের। শীতের সময় আমরা নারী-পুরুষ সবাই বুট ব্যবহার করি।

সর্বত্র তল্লাশি চলছে। এক সিপাহী জাবেদ আহমাদ শালাহ-এর পরিচয়পত্রটা হাতে নিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, এই লোকটা কে?

আমি বললাম, এটা বেলাল আহমাদ বেগ-এর পরিচয়পত্র। সে এখন হেরানগর জেলে বন্দী।

সিপাহী বলল, কিন্তু এর মধ্যে তো বেলাল বেগ-এর নাম লেখা নেই।

আমি বললাম, এটা বোধ হয় তার কোডনাম।

সিপাহী জিজ্ঞেস করল, তার কোডনাম কী?

বললাম, আমার জানা নেই; এতে যা লেখা আছে তা-ই।

জাবেদ আহমাদ-এর আইডি কার্ডটা পকেটে পুরে নিয়ে সিপাহী একটা পাসপোর্ট বের করল। এটা রফীক খানের পাসপোর্ট। আমাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, এই লোক কে?

আমি বললাম, আমার দেবর।

সিপাহী বলল, তা তার পাসপোর্ট তোমার ঘরে কেন?

আমি বললাম, এটা তার ভাইয়ের ঘর; রাখতে পারে।

জিজ্ঞেস করল, সে কোথায় থাকে?

বললাম, নওয়াব বাজারে।

কী কাজ করে?

বললাম, গাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা করে।

সিপাহী বলল, আমরা তদন্ত করে দেখব। যদি মিথ্যা হয়...!

ঠিক তখন দলের অফিসার উপর থেকে নেমে এল। তার হাতে একটা পিস্তল। অফিসারকে পিস্তল হাতে নামতে দেখে আমার কলিজা শুকিয়ে গেল। পিস্তলটা শাব্বীর আহমাদ বাট-এর। সম্ভবত লোকটা আন্ডারগ্রাউন্ডে যাওয়ার সময় পিস্তলটা নিতে ভুলে গেছে!

অফিসার আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ঘরে পিস্তল কেন?'

'কেন?' প্রশ্নের জবাবে কিছু বলার আগেই অফিসার আমার মুখে সজোরে চড় মারল। মাথার চুলগুলো মুঠি করে ধরে টানা-হেঁচড়া শুরু করল। আমাকে দুহাতে ধরে উচেঁ তুলে মেঝেতে ছুড়ে মারল। গালাগাল করতে করতে আমার গায়ে এলোপাতাড়ি লাথি মারতে থাকল। আমি সব অত্যাচার নীরবে সহ্য করলাম। উহ্ পর্যন্ত করলাম না। তারপর অফিসার চুল ধরে টেনে আমাকে দাঁড়া করাল এবং দেওয়ালের সঙ্গে চেপে ধরে দুহাতে সর্বশক্তি ব্যয় করে আমার বুকের উপর চাপ দেয়। আমার এই করুণ অবস্থা দেখে কন্যা সায়েমা আহত বাঘিনীর মতো ছুটে এসে অফিসারের দুহাত খামচে দেয় এবং রাগের স্বরে বলে, 'তুমি আমার আম্মুর সঙ্গে এমন আচরণ করছ কেন? আমাদের সাথে এমন দুর্ব্যবহার করার অধিকার তোমাদের নেই। তোমরা অন্যায় করছ। তোমরা সীমালংঘন না করে তল্লাশি করে চলে যাও।'

অফিসার সায়েমার মুখের উপর কষে একটা চড় মেরে বলল, 'খামোশ হারামজাদী! মুখরো কোথাকার। আমি জানি, তুই দোখতারানে মিল্লাত-এর সঙ্গে কাজ করিস্।'

আমি বললাম, এই একটুখানি মেয়ে দোখতারানে মিল্লাতের সাথে কাজ করে এ আপনি কী বলছেন! ঐ সংগঠনে তো প্রাপ্তবয়স্করা কাজ করে। তাও শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী মেয়েরা।

অফিসার বলল, তুমি বড় মুখরা মেয়ে। আমি তোমার জিহ্বাটা...। দাঁত কড়মড় করে সে তার বাঁ হাতে আমার মুখমণ্ডল চেপে ধরে আমাকে জিহ্বা বের করতে বলে। জবাবে আমি তার শার্টের কলার ধরে এমন ঝটকা এক টান দেই যে, লোকটা পড়িমড়ি করে দাঁড়িয়ে যায়।

আমি রাগে-ক্ষোভে দাঁত খিঁচে তাকে উদ্দেশ করে বললাম, তুমি যদি আমার সঙ্গে আর বাড়াবাড়ি কর, তাহলে তোমাকে কাঁচা চিবিয়ে খাব। আমাকে তুমি দুর্বল মনে করো না।

আমার কঠোর প্রতিক্রিয়া ও মারমুখী অবস্থান দেখে লোকটা হাত গুটিয়ে নিল ঠিক; কিন্তু মুখে যা তা ভাষায় অসহনীয় গালিগালাজ করতে থাকে। আমার মন চায়, ঝাপটে ধরে লোকটার গণ্ডযুগল খামচে দিই। কিন্তু আমাকে ধৈর্যধারণ করতে হল। পিস্তলটাই আমাকে অনেকখানি দুর্বল করে ফেলেছে। তাই বাধ্য হয়েই আমাকে আত্মসংবরণ করতে হয়।

আমার মুখে ফেনা এসে যায়। আমি থুতু ফেলার জন্য বাইরে যেতে উদ্যত হই। এমন সময় সায়মা দ্রুত আমার কাছে ঘেঁষে নির্লিপ্তের মতো আমাকে ফিসফিস করে বলল, 'আম্মী! আমি তোমার কাছে থাকলে তুমি ওদের কোন প্রশ্নের কী জবাব দাও, তা আমার জানা হয়ে যায়; আমাকে আলাদা করে নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করলে যেন আমিও একই জবাব দিতে পারি।'

মেয়ের পরামর্শটা আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হলো। সে সময় থেকে আমি মেয়েটাকে এক মুহূর্তের জন্যও আমার থেকে আলাদা করিনি। আমার এই ছোট্ট মেয়েটা সৈন্যদের প্রশ্ন ও আমার উত্তরগুলো মুখস্থ করে রাখে।

অফিসার আবার বলল, তোমার ঘরে একটা পিস্তল যখন পেলাম, তখন আরো অস্ত্র নিশ্চয় আছে।

আমি বললাম, দেখুন, পিস্তলটার ব্যাপারে যদি আমার কিছু জানা থাকত, তাহলে ওটা আপনি খুঁজে পেতেন না, আমি ওটাকে এভাবে চোখের সামনে ফেলে রাখতাম না।

অফিসার বলল, অস্ত্রটা তোমার ঘরে পাওয়া গেল আর তুমি এ ব্যাপারে কিছুই জান না?

আমি বললাম, দেখুন, আসল ঘটনা হলো, কয়েক দিন আগে বিএসএফ-এর ধাওয়া খেয়ে এক মুজাহিদ পালিয়ে এসে আমার ঘরে ঢুকে পড়েছিল। বিএসএফ জওয়ানদের চলে যাওয়া পর্যন্ত সে ঘরের উপর

তলায় লুকিয়ে ছিল। এই পিস্তল হয়ত তার। সজ্ঞানে হোক ভুলে হোক সে-ই এটা রেখে গেছে।

অফিসার বললেন, তা-ই যদি হয়, তুমি সেই সন্ত্রাসীর ব্যাপারে বিএসএফ-এর জওয়ানদের সংবাদ দিলে না কেন?

আমি বললাম, তার কাছে অস্ত্র, আমি কিভাবে তার বিপক্ষে অবস্থান নিই? সে আমাকে মারতে পারত, যেমন তোমরা মারছ। কারণ, তোমাদের কাছেও অস্ত্র আছে।

কী জানি লোকটা আমার কথায় বিশ্বাস করল কি করল না। কিন্তু টানা তিন ঘন্টা পর্যন্ত আমাদের উপর অত্যাচার চালিয়ে যায়। গোটা ঘর তন্ন-তন্ন করে খুঁজে ফেরে। স্থানে-স্থানে ঘরের ভিটা খুঁড়ে অস্ত্র খোঁজে। আলমারি, টেবিল, চেয়ার, যেখানে যা পায় ভেঙ্গে চুরমার করে। কিন্তু তারপরও যখন কিছু পেল না, এবার তারা ক্ষান্ত হয় এবং ফিরে যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে গাড়ির নিকট চলে যায়।

চলে যাওয়ার জন্য বিএসএফ জওয়ানরা গাড়িতে উঠছে। সবাই গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে। এক সিপাহী প্রস্রাব করার জন্য টয়লেটে ঢোকে। টয়লেট থেকে সামান্য দূরে একস্থানে মাটি ঘেঁষে আন্ডারগ্রাউন্ডের সামান্য একটু ফাঁক। বাইরের হাওয়া-বাতাসের জন্য এই ফাঁকটুকু রাখা হয়েছিল। জনালার মতো করে পাল্লা সাঁটানো আছে তাতে। পাল্লাটা ভেতর থেকে সিটকিনি লাগিয়ে দিলে ফাঁকটা বাইরে থেকে দেখা যায় না। সে সময়ে এই জানালাটা খোলা ছিল।

টয়লেটের ভেতর থেকে এই ফাঁকটা সিপাহীর নজরে পড়ে। সে ভেতরে মানুষ দেখতে পায়। সঙ্গে-সঙ্গে টয়লেট থেকে বের হয়ে চিৎকার করে ওঠে-

'পাইছি রে পাইছি!'

সিপাহীর 'পাইছি রে পাইছি' চিৎকার শুনে গাড়িতে চড়ার জন্য অপেক্ষমাণ জওয়ানরা হুড়মুড় করে ছুটে আসে। সিপাহী কী পেয়েছে সবাইকে জানায় ও দেখায়। আর যায় কোথায়। বিএসএফ-এর জোয়ানরা ঘরের দেওয়াল ভেঙ্গে আন্ডারগ্রাউন্ডে ঢুকে পড়ে। তারা তাদের সব পেয়ে যায় আর আমরা আমাদের এতদিনের সব অর্জন হারিয়ে ফেলি। তারা

মুজাহিদদের প্রত্যেককে ধরে বাইরে এনে দাঁড় করিয়ে রাখে। তাদের চোখ কাপড় দিয়ে বেঁধে নিয়ে মারধর শুরু করে দেয়। গুদাম থেকে অস্ত্রগুলো সব বের করে নিয়ে আসে। সঙ্গে আমাদের ঘরের সবাইকেও আটক করে ফেলে।

ধৃত মুজাহিদ আহমাদ শালাহ তাদের উদ্দেশ করে বলল, 'আমি জাবেদ আহমাদ শালাহ। আমার সাথে মোহাম্মদ সিদ্দিক সুফী, শাব্বির আহমাদ বাট, মোহাম্মদ হোসাইন ও আলতাফ খান এ কজন মিলিট্যান্ট। আমাদের সঙ্গে তোমাদের যা করার করো। কিন্তু ঘরের লোকদের ছেড়ে দাও।

জওয়ানরা তার কথায় কর্ণপাত করল না। তারা বন্দুকের বাঁট দিয়ে পিটিয়ে-পিটিয়ে প্রত্যেককে রক্তাক্ত করে ফেলল। এবার জাবেদ বলল-

তোমরাও সৈনিক, আমরাও সৈনিক। আমরা একে অপরের শত্রু। তবে এ মুহূর্তে আমরা তোমাদের বন্দী। জয় আজ তোমাদের; কিন্তু আমাদের সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধবন্দীর মতো আচরণ করা উচিত।

অফিসার জাবেদকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। তারপর পায়ের বুট দ্বারা তাকে পিষ্ট করে, মাথায় আঘাত করে। বলে, শালা, তোরা যুদ্ধবন্দী নস্ – তোরা সন্ত্রাসী।

জাবেদ বলল, 'বুঝেছি, তোমরা আমার কথা বুঝবে না, অশোক পেটিয়লকে ডেকে আন।'

'তুই আমাকে অশোক পেটিয়লকে ডেকে আনার নির্দেশ দিচ্ছিস!' বলেই অফিসার রাইফেলের বাঁট দিয়ে জাবেদের দুপায়ে আঘাত করে। জাবেদের পা দুটো ভেঙ্গে যায়।

অন্যদিকে সিপাহীরা আমার পিতা জনাব ইউসুফ বেগ, স্বামী মকবুল জান, ভাই ফিরোজ আহমাদ ও শাকিল আহমাদ এবং পুত্র মুদ্দাসসির ও মাসাররাতকে বেদম প্রহার করছে। কাপড় দ্বারা তাদের চোখ ও বুটের ফিতা দ্বারা পেছন দিক থেকে দুবাহু একত্র করে বেঁধে রাখা হয়েছে। চরম নির্যাতনের শিকার হয়ে অসুস্থ ও খানিক আগে অত্যাচার ভোগকরা স্বামী মকবুল জানের রক্তবমি শুরু হয়ে যায়। আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। চিৎকার করে বলে উঠলাম-

'থাম! তোমরা কি এদের প্রাণে মেরে ফেলতে চাও? আমার বাবা অসুস্থ বৃদ্ধ। স্বামী রক্তবমি করছে। অন্যদের তোমরা রক্তাক্ত করে ফেললে... ।

আমি আর কিছু বলতে পারলাম না। মুখ থেকে এতটুকু কথা বের হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে এক সিপাহী ছুটে এসে আমার চুলগুলো মুঠি করে ধরে ঝটকা এক টান দেয়। ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে পিঠ ও কোমরে লাথি মারে। সে আমাকে আধমরা করে ফেলে রাখে।

আমি হাঁফাচ্ছিলাম। এক অফিসার সিপাহীকে বলল, 'এই ঘরের কর্তাটাকে আমার কাছে নিয়ে আয়।'

মকবুল জানকে তার কাছে নিয়ে আসা হলো। আমি পাশেই দাঁড়ানো। অফিসার সিপাহীকে বলল, 'এর পরনের কাপড়গুলো সব খুলে উলঙ্গ কর এবং স্ত্রী-কন্যাদের চোখের সামনে হত্যা করে ফেল।'

সিপাহী মকবুল জানের কাপড় খুলতে শুরু করে। অসহায় মকবুল জান লজ্জায় অবনত হয়ে যায়। কন্যা সায়েমা ও নারগিস পাশে দাঁড়ানো। কন্যার সামনে পিতার এই অপমান কে সইতে পারে বলুন? অন্যদের চোখ তো বাঁধা। তারা কেউ দেখতে পাচ্ছে না। দেখছি শুধু আমি ও আমার কন্যারা। আর ওরা তো হায়েনা। আমি স্বামীকে উদ্দেশ করে বললাম, কোনো পরোয়া নেই। শাহাদাতের মর্যাদা পেতে লজ্জা কিসের?

আমার মুখ থেকে 'শাহাদাত' শব্দ শুনে অফিসার অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে। জবাবে সে কিছু বলার আগেই মকবুল জানের সমস্ত কাপড় খুলে ফেলা হয়। সঙ্গে-সঙ্গে পুনরায় তার রক্তবমি শুরু হয়ে যায়। মুখ দিয়ে রক্ত বের হতে দেখে অফিসার তাকে কাপড় পরে নিতে বলে।

স্বামীকে কাপড় পরতে দেখে আমার দেহে প্রাণ ফিরে আসে। আমি সামনে অগ্রসর হয়ে তাকে কাপড় পরতে সাহায্য করি। নির্যাতনে তার হাত-পা অবশ হয়ে গিয়েছিল। তখন অন্য এক অফিসার আমাকে লক্ষ্য করে বলে-

'আমরা তোমার ব্যাপারে অনেক কিছুই কানে শুনেছিলাম। এবার চোখে দেখলাম, তুমি কত ভয়ংকর নারী। সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী তো তুমিই। তুমিই সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দিচ্ছ। অস্ত্রের এত বিশাল ভাণ্ডার উদ্ধার

হলো তোমার ঘর থেকে। তোমার আর রক্ষা নেই। তোমাকে আমরা জীবন্ত ছাড়ব না।'

অফিসারের বক্তব্যের প্রতি আমার কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না। এতজন মুজাহিদ ধরা পড়ে গেল। সঙ্গে অস্ত্রের এত বিশাল সংগ্রহ সরকারের হাতে চলে গেল, সেই দুঃখেই আমি মূহ্যমান। হৃদয়টা আমার ফেটে যাচ্ছিল। মস্তিষ্ক কাজ করছিল না। মাথার উপর বেদনার প্রচণ্ড একটা পাহাড় চেপে বসে ছিল যেন।

উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদ গাড়িতে বোঝাই করার পর ধৃত চোখবাঁধা পুরুষদের প্রত্যেককে গাড়িতে তুলে নেওয়া হলো। সবাই রক্তাক্ত। প্রত্যেকের দুবাহু পেছন দিক করে বুটের ফিতায় বাঁধা। হাড়গোড় চূর্ণবিচূর্ণ সবার।

এবার ওয়ারলেসের মাধ্যমে বিএসএফ-এর অন্য কোম্পানীকে তলব করা হলো। নতুন কোম্পানীকে কেন তলব করা হলো, বুঝতে পারলাম না। অর্ডার পেয়ে এক কোম্পানী রওনা হয়। এই ফাঁকে লনে বসে কয়েকজন অফিসার আলাপ জুড়ে দেয়। একজন বলল-

মিলিট্যান্টদের দিক থেকে আক্রমণ হওয়ার অজুহাত দাঁড় করিয়ে আমরা অধিবাসী ও মিলিট্যান্টদেরসহ বাড়িটা উড়িয়ে দিচ্ছি না কেন?

জবাবে অন্যজন বলল, তাতে লাভ কী হবে?

একজন বলল, ঘরে যা কিছু ছিল সব তো নিয়েই নিলাম। এখন আর লোকগুলোকে মেরে লাভ কী?

প্রথমজন বলল, অস্ত্র ছাড়া সোনা-রূপাসহ বিপুল ধন-সম্পদও উদ্ধার করেছি। এখন যদি আমরা লোকগুলোকে মেরে ফেলি, তাহলে এগুলোর কোনো দাবিদার থাকবে না। সব আমরা ভাগ করে নিয়ে যাব।

না, আমি এর অনুমতি দিতে পারি না। বললেন আরেকজন।

তৃতীয় একজন বলল, এ সিদ্ধান্ত কেন্দ্রকে ঘটনা অবহিত করার আগে নেওয়া উচিত ছিল। এখন তো অন্য ব্যাটলিয়ন এসে পড়ছে।

আরেকজন বলল, আমরা কেন্দ্রকে মিলিট্যান্ট গ্রেফতার হওয়া এবং অস্ত্র উদ্ধারের সংবাদ পাঠিয়েছি। এখন ফায়ারিং করার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

প্রস্তাবকারী বললেন, আমরা বলতে পারব রওনা হওয়ার আগে আমাদের উপর হামলা হয়েছিল।

একজন বলল, কিন্তু এ্যাকশনে যাওয়ার আগে আমরা কজন মরলাম, কজন আহত হলাম, তা তো দেখতে হবে। এর জন্য কে প্রস্তুত আছে?

প্রথমজন বলল, দ্রুত একটা সিদ্ধান্ত করে ফেলুন। এদের প্রত্যেককে হত্যা করলে আমরা সম্পদে লাল হয়ে যাব।

তাদের হত্যা না করেও আমি তোমাদের প্রত্যেককে লাল করে দিতে পারি। ঘর থেকে যা কিছু উদ্ধার করলাম, তার কিছুই ওরা ফেরত পাবে না। কাজেই অন্য কোনো চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। বলল একজন।

বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের এই কথোপকথন আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম। তারা উদ্ধার করা সোনাদানা, মূল্যবান সম্পদ পোটলায় বেঁধে নিয়েছিল। কিছু জিনিস বাঁধার জন্য কোনো কাপড় পাচ্ছিল না। এক সিপাহী এসে কিছুই না বলে আমার মাথা থেকে ওড়নাটা টান দিয়ে নিয়ে নেয়।

খানিক পর নতুন কোম্পানী এসে হাজির হয় আর এই কোম্পানী হেডকোয়ার্টার অভিমুখে রওনা হয়ে যায়।

ফিরোজ আহমাদ বেগ

সীমান্তের ওপার থেকে বেলাল বেগ ফিরে আসার পর তার সশস্ত্র মুজাহিদ হওয়ার গুজব ছড়িয়ে পড়ে। এবার হেলাল আহমাদ বেগের পর বেলাল আহমাদ বেগের ঘরে হানা পড়তে শুরু করে। হানার সময় ভাইয়ের অবস্থান বলার জন্য আমাদের উপর মারপিট চলতে থাকে। আমি (ফিরোজ আহমাদ বেগ) যথারীতি নিজের কাজ চালিয়ে যেতে থাকি। এক পর্যায়ে নেছার আহমাদ জোগিকে পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। তার মুক্তির জন্য যখন মুশিরুল হক ও খিড়া অপহৃত হয়, তখন আমাদের ঘরে যেনা কেয়ামত শুরু হয়ে যায়। একের পর এক হানা চলতে থাকে। মারপিট, জুলুম-নির্যাতন অব্যাহত থাকে। আমি ও ভাই শাকিল আত্মগোপন করি। শাকিল ও আমার অনুপস্থিতিতে যখন আব্বা-আম্মার উপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়, তখন আমিও অস্ত্র হাতে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। ভারতীয় ফৌজ ও ফোর্সের অত্যাচার দেখে আমি বললাম, এখন কাশ্মিরের প্রত্যেক মানুষের হাতে অস্ত্র তুলে নেওয়া দরকার। শিশু-বৃদ্ধ কারুরই আর নিরস্ত্র থাকার সুযোগ নেই। নিজের ইজ্জতের হেফাযতের জন্য নারীদেরও এখনই হাতে অস্ত্র তুলে নেওয়া আবশ্যক।

১৯৯১ সালের জুন মাসে আমি সীমান্তের ওপারে যাই। ক্যাম্পে হাজির হওয়ার দিনকয়েক পর ইখওয়ানুল মুসলিমীনের আমীর হেলাল আহমাদ বেগের সঙ্গে মুজাফফরাবাদে আমার সাক্ষাৎ হয়। আমাকে দেখে তিনি চমকে উঠে বললেন, 'তোমাকে এখানে কে আসতে বলল? পিতামাতাকে কার কাছে রেখে এসেছ? বৃদ্ধ মা-বাবা ছাড়া তোমাদের ঘরে আর কে আছে?'

আমি তাকে বিস্তারিত সব বললাম। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, যখন এসেই পড়েছ দ্রুত প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে পিতামাতার কাছে চলে যাও। ঘরে বৃদ্ধ মা-বাবার তোমাকে একান্ত প্রয়োজন।'

আমি আযাদ কাশ্মির ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে দীর্ঘ এক বছর অবস্থান করি। এক বছর পর যখন আমি শ্রীনগর পৌঁছি, সে সময় দোরায়ে সোয়ামীকে মুক্ত করে দেওয়া হয়। আমি শুনেছি, তাকে নাকি ইখওয়ানুল মুসলিমীন অপহরণ করেছিল। তার বিনিময়ে ৫জন মুজাহিদকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ডাউন টাউনে জাভেদ আহমাদ শালাহ'র সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে তার কাছে রেখে যান। তিনি যখন যে হাইড আউটে থাকছেন, আমাকেও সেখানে সঙ্গে রাখছেন। এ সময়ে একদিন আমার একসঙ্গী গ্রেফতার হয়ে যায়। আমি হাইড আউট পরিবর্তন করে আমীর আকদালের দিকে রওনা হই। বুডশাহ পুলের নিকট পৌঁছলে আমিও ধরা পড়ে যাই। ভারতীয় বাহিনী আমাকে ধরে নিয়ে যায়।

এ ঘটনা ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসের। আমার গ্রেফতারির ঘটনা এ-ই প্রথম। আমাকে বুডশাহ পুলের সন্নিকটস্থ উখারা বিল্ডিংয়ে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সেখান থেকে বের করে গাগরপুল নামক স্থানে এক হোটেলে নিয়ে যায়। আমার দু-চোখে পট্টি বেঁধে দেওয়া হয়। দুবাহু কোমরের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। আমাকে মিলিট্যান্ট ও তাদের অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। আমি পরিষ্কার অস্বীকার করি যে, আমি মিলিট্যান্ট নই। তারা অবর্ণনীয় নির্যাতন চালিয়ে আমার থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করার চেষ্টা করে।

আমার কাছে কোনো তথ্য না পেয়ে তারা আমাকে হরিয়ানা পাঠিয়ে দেয়। এখানে আমাকে এত বেশি টর্চার করা হয় যে, আমার নাক-মুখ দিয়ে রক্ত ঝরতে শুরু করে। পিঠে গরম ইস্ত্রি রেখে নির্যাতন চালানো হয়। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আমি চিৎকার করতে শুরু করি। ঠিক সে সময় মুখোশপরা দুই যুবককে ভেতরে নিয়ে আসা হয় এবং তাদেরকে আমার পরিচয় দেওয়া হয়, আমি ভয়ঙ্কর মিলিট্যান্ট বেলাল আহমাদের ভাই এবং ইখওয়ানুল মুসলিমীনের আমীর হেলাল বেগের আত্মীয়।

তারপরই শুরু হয় নির্যাতনের নতুন মাত্রা। আমাকে শিকল দ্বারা বেঁধে ছাদের সঙ্গে ঝুলানো হয়। নিচে একটা টেবিলের উপর জ্বলন্তস্টোভ রাখা হয়। স্টোভের অগ্নিশিখা আমার মাথা স্পর্শ করছে। যখন আমার মাথার চুল পড়ুতে শুরু করে, তখন আমি স্বীকার করে নিই, হ্যাঁ, আমি মিলিট্যান্ট। তারা আমাকে আমার ও অন্যান্য মুজাহিদদের অস্ত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আমি আমার অজ্ঞতার কথা জানিয়ে দিই।

আবারও নির্যাতন শুরু হয়ে যায়।

এবার তারা আমাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে আবার ছাদের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখে এবং বিদ্যুতের শক দেয়। শক খেয়ে যখনই আমার শরীর কেঁপে ওঠে, সঙ্গে-সঙ্গে তারা আমার শরীরে ছুচালো সুইঁয়ের খোঁচা মারে। সহ্য করতে না পেরে আমি স্বীকার করে নিই, আমার ব্যক্তিগত সব জিনিসপত্র আমার বাড়িতে রাখা আছে। ফলে রাত দশটার সময় আমাকে গাড়িতে তুলে আমার বাড়িতে নিয়ে যায়। সাত-আট গাড়ি সৈন্য আমার সঙ্গে আসে।

সৈন্যরা আমাদের ঘরটা চারদিক থেকে ঘিরে তল্লাশি শুরু করে দেয়। কিন্তু তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত কিছুই পেল না। অগত্যা আমার ভাই শাকিলকে জিজ্ঞেস করে, তোর ভাইয়ের রাইফেল কোথায়? শাকিল এ ব্যাপারে অজ্ঞতা প্রকাশ করলে সৈন্যরা তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে পদপিষ্ট করে এবং তার হাত-পা ভেঙ্গে দেয়। তারা আমাদের দু'-ভাইকে ঘরেও বেদম প্রহার করে এবং অর্ধ অচেতন অবস্থায় হরিনওয়াস নিয়ে গিয়ে নির্যাতন চালাতে থাকে। শাকিল পনেরো দিন পর্যন্ত আমার সঙ্গে অবস্থান করে। দুজনকে আলাদা-আলাদা সেলে রাখা হলেও টর্চারের সময় এক কক্ষে নিয়ে আসা হতো।

পনেরো দিন পর শাকিলকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপর থেকে তারা আমাকে আপন করে নেওয়ার চেষ্টা শুরু করে। তারা আমাকে বলল, তুমি যদি আমাদের তিনজন লোককে ধরিয়ে দাও, তাহলে আমরা তোমাকে প্রচুর অর্থ-সম্পদ দেব, দিল্লীতে থাকার জন্য কোয়ার্টার দেব এবং তোমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব। চাকরি চাইলে তাও দেব। হেলাল বেগ, জাভেদ শালাহ ও বহেনজীকে আমাদের প্রয়োজন।

আমি বললাম, এই বহেনজী কে?

তারা বলল, তোমার বোন! চেন না বুঝি? ফরীদা যার নাম।

আমি বললাম, এ নামে আমার কোনো বোন নেই।

তারা বলল, কী বলছ তুমি? ফরীদা যদি বেলালের বোন হয়, তাহলে তোমার বোন নয় কেন?

আমি বললাম, না, ফরীদা নামে আমার কোনো বোন নেই।

তারা বলল, ঠিক আছে, বেলালের বহেনজীকে ধরিয়ে দাও।

বললাম, আমি কী করে বলব তিনি কোথায় আছেন?

তারা বলল, তোমার সবই জানা আছে। দেখো বেটা, তুমি যদি বহেনজীকে ধরিয়ে দিতে পার, তাহলে আমরা তোমাকে ছেড়েও দেব আবার পুরস্কৃতও করব।

আমি বললাম, আলুচাবাগে বেলাল নামে কয়েকটা ছেলে আছে। আপনারা কোন বেলালের বোনের কথা বলচেন?

তারা বলল, আচ্ছা, তুমি জাভেদ শালাহ আর খোরশেদ বেগের ঠিকানা বলো।

আমি বললাম, আমি খোরশেদ বেগকে চিনি ঠিক; কিন্তু বর্তমানে সে কোথায় থাকে সঠিক বলতে পারব না। আর জাভেদ শালাহকে আজ পর্যন্ত কখনও দেখেনি।

তারা বলল, হেলাল বেগকে তো জান নিশ্চয়ই?

আমি বললাম, হ্যাঁ, ভালো করেই জানি। শৈশব থেকেই তার সঙ্গে আমার পরিচয়।

তারা বলল, এখন দেখলে চিনবে তো।

আমি বললাম, কেন চিনব না?

তারা বলল, তাহলে আমাদের সঙ্গে চলো; সে কোথায় আছে দেখিয়ে দাও।

আমি বললাম, তিনি তো এখানে নেই। দোরায়ে সোয়ামীর মুক্তির বিনিময়ে জাভেদ শালাহকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে তিনি পাকিস্তান চলে গেছেন।

আমার মুখ থেকে এই জবাব শুনে অফিসার ইন্সপেক্টরকে বললেন, 'ভেতর থেকে আলতাফ খানের ফাইলটা নিয়ে আসো।' খানিজ পর ইন্সপেক্টর আলতাফ খানের ফাইল নিয়ে এলে অফিসার তাতে তার জবানবন্দি পড়ে ইন্সপেক্টরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এর বক্তব্য আলতাফ খানের বক্তব্যের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। তার অর্থ হেলাল বেগ এখানে নেই।'

অফিসার নিশ্চিত হয়ে যান, আমি যা বলছি সবই সত্য।

শাকিলের মুক্তির বিশ দিন পর আমার এখানে অনেকগুলো যুবককে একত্রিত করা হয়। তাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হলো। প্রোগ্রাম হলো, হরিনাওয়াসের সব কয়েদীকে বিভিন্ন জেলে স্থানান্তর করা হবে। আমাকে জম্মুগামী দলে শামিল করা হলো। জম্ম নিয়ে যাওয়ার জন্য চোখে পট্টি ও হাত পিঠমোড়া করে বেঁধে গাড়িতে তোলার আগে আমাদের নাম ডাকা হয়। তন্মধ্যে নূর মোহাম্মদ কালওয়াল, জেনারেল মুসা ও আলতাফ খান আমার পরিচিত নাম। আলতাফ খানের নাম শুনে আমি বেশ আনন্দিত হলাম। কারণ, আলতাফ খান আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেও হয়ত আমার নাম শুনে খুশি হয়ে থাকবে।

কোর্ট বিলওয়াল পৌঁছার পর এখনও আমাদের চোখের পট্টি খোলা হয়নি। হাতও বন্ধনমুক্ত হয়নি। ভারতীয় জনতা পার্টি ও শিবসেনার গুন্ডারা এবং সঙ্গে কতিপয় কাশ্মিরি পণ্ডিত আমাদেরকে এমনভাবে মারপিট করে যে, আমরা সবাই রক্তাক্ত হয়ে পড়ি। মারপিটের সঙ্গে তারা আমাদের অকথ্য ভাষায় গালাগাল করতে থাকে।

ঘটনাক্রমে আলতাফ খানকে আমার সঙ্গে এক সেলে রাখা হয়। অন্যান্য কয়েদীদের মতো আমরা দুজনও রক্তাক্ত, আহত। কিন্তু একে অপরকে পেয়ে আমরা সব দুঃখ-বেদনার কথা ভুলে যাই। এখানে আমরা প্রায় এক বছর অবস্থান করি।

রমযানের এক রাতে আমরা তারাবীহর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এমন সময়ে সংবাদ এল, আগামীকাল আমি মুক্তি পাচ্ছি। আলতাফ খানের জন্য সংবাদ এল, তাকে শ্রীনগর স্থানান্তর করা হবে। এ রাতে আমরা একতিলও ঘুমাইনি। দুজন বসে-বসে কথা বলে রাত কাটাই। পরদিন

ভোর ছটার সময় আমাদের এয়ারপোর্ট পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ফ্লাইট না পাওয়ায় তালাবতিলু নামক স্থানে একটি সেলে রেখে দেয়। খাটুয়া জেল থেকে আবদুল মজিদ মীর এবং নাসির আহমাদ বাটকেও এনে আমাদের সঙ্গে রাখা হয়।

পরদিন আমাদের শ্রীনগর পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এখানে আমাদের জেমাইসিতে রাখা হয়। ড. হায়দার, আবদুল মজীদ ও জম্মুর পারভীন নামক এক মহিলাকে পূর্ব থেকেই এখানে রাখা হয়েছে। আমাদের এ সাতজনকে এখান থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

আমরা মুক্তি পাই ১৯৯৩ সালের ১৭ মার্চ। আমি কিছুদিন ওয়ান্টাপুরা অবস্থান করে বামনা চলে যাই। ২৪ ও ২৫ মার্চ মধ্যরাতে হানা হয়। এই হানা-অভিযানে আমাদের আন্ডারগ্রাউন্ড ধরা পড়ে গেলে আমি জাভেদ আহমাদ শালাহকে বললাম, অনুমতি দিন; আমি ফায়ার করি। তিনি নিষেধ করলেন। কারণ, তাতে ইউসুফ বেগের গোটা পরিবার ধ্বংসের মুখে নিপতিত হওয়ার আশংকা ছিল। তাই আমরা সেই ঝুঁকি না নিয়ে নিজেরাই ধরা দিলাম। তারপর যা ঘটল, তা বর্ণনার অতীত।

কয়েক দিন টর্চারের পর আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমাদেরকে পাপাটু পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সে সময়ে আমি জানতে পারলাম, অস্ত্র দেখানোর জন্য হাইড আউট নিয়ে যাওয়ার সময় পথে জাভেদ আহমাদ শালাহ ও মোহাম্মাদ সিদ্দিকী সুফী পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

তথ্য আদায় করার জন্য আমাদের উপর যে নির্যাতন চালানো হয়, তা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ ও জুলুম-নির্যাতনের পর আমাকে সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

আমি ১৯৯৪ সালের জানুয়ারি মাসে মুক্তি পাই।

মোহাম্মাদ মকবুল জান

আমি সব সময় নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড তো দূরের কথা, নিজের পারিবারিক ব্যাপার-স্যাপার থেকেও আমি উদাসীন ছিলাম। সকালে ঘুম থেকে উঠে কারখানায় চলে যেতাম আর ক্লান্ত শরীর নিয়ে সন্ধ্যায় বাসায় ফিরতাম। ঘর গেরস্থলির যাবতীয় কর্মকাণ্ড আঞ্জাম দিত আমার স্ত্রী ফরীদা। আমিও কখনও তার কাজে হস্ত ক্ষেপ করতাম না, সেও কখনও কোনো অভিযোগ করত না। আল্লাহ আমাকে অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও বুদ্ধিমতী স্ত্রী দান করেছেন।

আমার স্ত্রী ফরীদা যখন যখন কাশ্মিরের আযাদি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে শুরু করে, তখন আমি তার এ কাজেও কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করিনি। সত্য কথা বলতে কি, বিয়ের পর আমি যেখানে প্রতিটি কাজে তাকে সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়েছি, তেমনি আযাদি আন্দোলনেও তাকে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিনি। এই আযাদি আন্দোলনকে আমি একটি নেক কাজ মনে করি।

মূলত ১৯৭৭ সাল থেকেই আমার মন-মস্তিষ্ক থেকে হিন্দুস্তানের মানচিত্র মুছে গেছে। আমার এই মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে একটি ঘটনার সূত্র ধরে। ঘটনাটি হলো, টুরিস্ট সেন্টারের কাছে এক ফৌজি জওয়ান এক মুসলিম স্কুল ছাত্রীর ইজ্জতের উপর হামলা করে। পার্শ্বে দণ্ডায়মান এক ট্যাক্সিচালক এগিয়ে এসে মেয়েটাকে শুধু উদ্ধারই করেনি, লোকটার উর্দি ছিঁড়ে ফেলে এবং চড়-থাপ্পর দিয়ে বিদায় করে দেয়। শেষ পর্যন্ত লোকটা পালিয়ে প্রাণরক্ষা করে।

সন্ধ্যার সময় সৈন্যটি তার ইউনিটের অন্য সদস্যদের নিয়ে আসে। এসেই তারা এলাকায় তাণ্ডব শুরু করে দেয়। টুরিস্ট সেন্টার থেকে নিয়ে

লালচক পর্যন্ত যত গাড়ি পেল সব ভেঙ্গে ফেলে এবং চালকদের মারধর শুরু করে দেয়। লালচক পৌঁছে সেখানকার ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে আগুন ধরিয়ে দেয়। আইনের লোকদের এই ধ্বংসযজ্ঞ, তাণ্ডব ও বে-আইনী কর্মকাণ্ড দেখে এলাকাবাসী হতভম্ভ হয়ে যায়। শেখ আবদুল্লাহসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিষয়টি অবহিত করেও কোনো কাজ হয়নি। শত চেষ্টা করেও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা যায়নি।

আমি তখনই উপলব্ধি করেছি, ভারতের মানচিত্র একদিন ছিঁড়ে যাবে। কাশ্মিরি মুসলমানদের বাঁচতে হলে কাশ্মিরকে আযাদ করতেই হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জুলুমের নৌকা যখন ভরে ওঠে, তখনই তা ডুবে যায়। এখন আমার আকাঙ্ক্ষা, ভারতের জুলুমের নৌকা করে ডুববে, সেই দৃশ্য সচক্ষে দেখা।

শাকিল আহমাদ বেগ

আমি সীমান্তের ওপারে কিংবা এপারে না কোনো অস্ত্রপ্রশিক্ষণ নিয়েছি, না সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিয়েছি। আমি স্বাধিকার আন্দোলনকে সমর্থন করে আসছি শুধু। আমি বিবাহিত। স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে। সংসার নিয়েই আমি সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকি। বাটামালু নামক স্থানে আমি মিস্ত্রির কাজ করতাম। যখন থেকে আমার বুঝ-বুদ্ধি হয়, তখন থেকেই আমি জনসাধারণের ওপর আগ্রাসী সরকারের নির্যাতন দেখে আসছি। কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক না থাকায় আমি না কখনও সেই নির্যাতনের প্রতিবাদ করেছি, না কখনও কোনো প্রতিবাদে অংশ নিয়েছি। আমি মনে-মনেই জ্বলতে থাকি।

মুসলিম মুত্তাহাদা মাহায-এর পক্ষ থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের ঘোষণা দেওয়া হলো। নির্বাচন হলো। আমি দলের প্রার্থীকে ভোট দেওয়া পর্যন্ত নিজের তৎপরতাকে সীমাবদ্ধ রাখি।

এজাজ ডার-এর শাহাদাতের পর যখন কাশ্মিরে সশস্ত্র আন্দোলন জোরদার হতে শুরু করে, তখন প্রথম -প্রথম আমি সেই আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ আস্থা আনতে পারিনি। আমার ধারণা ছিল, এ আন্দোলন জাতির কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে সক্ষম হবে না। অথচ আমার ছোট ভাই ও বড় বোন এই আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী।

আমার ভাই বেলাল আহমাদ বেগ যখন সীমান্তের ওপারে চলে যায় এবং সেখান থেকে আমার কাছে পত্র পাঠায়, তখন আমি টের পাই, 'ডাল মে কুচ কালা হ্যায়'। আমি অনুভব করি, কিছু একটা হচ্ছে এবং হবে। সশস্ত্র আন্দোলন শুরু হয়ে গেলে আমার বোন ফরীদার বাড়ি তার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়ে যায়। বোন ফরীদার বাড়িতে হানা পড়তে শুরু

করে। যেহেতু আমার বোনের বাড়ি, তাই আমি হানা-তল্লাশিতে নির্যাতনের শিকার হই। ছোট ভাই ফিরোজ বেগের গ্রেফতারির পর আমিও নিজঘরে আক্রমণের শিকার হই এবং প্রথম আঘাতেই আমার হাত-পা ভেঙ্গে দেওয়া হয়। তখন আমার বুঝে আসে কাশ্মিরের প্রতিটি নাগরিকের জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়া কেন আবশ্যক। মুজাহিদদের ঠিকানা এবং ফিরোজের রাইফেল কোথায় আছে বলে দেওয়ার জন্য ইন্টারোগেশন সেন্টারে আমার উপর এত নির্যাতন করা হয় যে, আমি বাঁচার আশাই ত্যাগ করি। আমি মনে করি, ইন্টারোগেশন সেন্টার থেকে যদি কেউ নিরাপদ ফিরে আসে, তাহলে বুঝতে হবে, এ এক মস্তবড় কারামাত।

বেলাল ও ফিরোজের গ্রেফতারির পর ঘরে আমিই একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি এবং আমার ছোট ছোট সন্তান আছে। সে কারণে পরিবারের পক্ষ থেকে আমাকে মুক্ত করে আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ ব্যাপারে নজির সিদ্দিকীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো। তিনি আর্মি অফিসারদের ২৫ হাজার টাকা দিয়ে আমাকে ছাড়িয়ে আনেন।

ভারতীয় বাহিনী ও অন্যান্য ফোর্সের কাছে বেগ পরিবার এখন হিটলিস্টে। তাই মুক্তির মাত্র অল্প কদিন পর পুনরায় ক্র্যাকডাউন দিয়ে আমাকে গ্রেফতার করা হয়। আমার চোখে পট্টি বেঁধে ইন্টারোগেশন সেন্টারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। হেলাল বেগ ও বহেনজীর ঠিকানা বলার জন্য আমার উপর নির্মম নির্যাতন শুরু করা হয়। প্রথম জিজ্ঞাসাবাদেই আমার উভয় বাহুর জোড়া আলাদা করে ফেলা হয়।

পরে এই জোড়া যথাস্থানে স্থাপন করতে অনেক সময় ব্যয় হয়। আমি চিৎকার শুরু করলে আমার মুখের মধ্যে বন্দুকের নল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তাতে মুখে ও তালুতে জখম হয়ে যায়। এত কিছু করেও যখন তারা স্বস্তি পাচ্ছিল না, তখন পরনের কাপড় খুলে আমাকে ছাদের সঙ্গে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হয়। নিচে মাথার কাছে জ্বলন্ত স্টোভ রাখা হয়। আগুনের তাপে যখন আমার মাথা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন সহ্য করতে না পেরে আমি বেলাল ও বহেনজীকে দেখিয়ে দেওয়ার কথা স্বীকার করি।

শিকল খুলে যখন আমাকে তাদের ঠিকানা বলার জন্য বলা হয়, তখন আমি অজ্ঞাত প্রকাশ করি। এবার তারা ক্ষিপ্ত হয়ে লাথি দিয়ে-দিয়ে

আমাকে আধমরা করে ফেলে। একপর্যায়ে যখন আমার নাক-মুখ দিয়ে রক্ত ঝরতে শুরু করে, তখন তারা আমাকে নিয়ে একটা সেলে আবদ্ধ করে রাখে। লাগাতার কয়েক দিন আমার উপর এরূপ টর্চার চলতে থাকে।

এ সময়ে আমার ভগ্নিপতি জানতে পারেন, কাসেম খাঁ টাকার বিনিময়ে বন্দীমুক্তির ব্যবস্থা করেন। সেনাবাহিনী ও অন্যান্য ফোর্সের সঙ্গে তার ভালো সম্পর্ক আছে। আমার ভগ্নিপতি তার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং আমার মুক্তির জন্য ১০ হাজার টাকা তার হাতে তুলে দেন। কিন্তু তাতে কাজ হলো না। কাসেম খাঁর সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ করা হলো। কিন্তু তিনি আমাকে মুক্ত করতেও পারলেন না, টাকাও ফেরত দিতে ব্যর্থ হলেন। অবশেষে নজির সিদ্দিকীর মাধ্যমে ১৫ হাজার টাকার বিনিময়ে আমাকে মুক্ত করা হয়।

১৯৯২ সালের ২৪ মার্চ ঘটনাক্রমে আমি আমার বোনের বাড়িতে ছিলাম। রাতে বিএসএফ ওখানে হানা দেয়। বোনের আন্ডারগ্রাউন্ড এক্সপোজ হয়ে যায়। অন্যদের সঙ্গে আমিও ধরা পড়ে যাই। আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে বের করে করিডোরে নিয়ে বিএসএফ সর্বপ্রথম আমার মুখমণ্ডল কাপড় দ্বারা বেঁধে ফেলে। জুতার ফিতা খুলে তা দ্বারা আমাকে পিঠমোড়া করে বাঁধে। তারপর বন্দুকের বাঁট ও ডান্ডা দ্বারা আমাকে প্রহার করে। তারা এক-এক করে আমাদের প্রত্যেককে বুট দ্বারা পিষ্ট করে। আমাদের হাড়গোড় ভেঙ্গে দেয়। সবাইকে রক্তাক্ত করে ফেলে। অবশেষে হেডকোয়ার্টার থেকে আরেকটি কোম্পানি ডেকে এনে আমাদেরকে টুটু গ্রাউন্ডের বিএসএফ ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এখানে সর্বপ্রথম জাবেদ আহমাদ শালাহকে জিাসাবাদ করা হয়। তারপর মোহাম্মদ সিদ্দিক সুফীকে। সিদ্দিক সুফীর পর সাব্বীর আহমাদকে। তারপর তলব পড়ে আমার। একজন আমার বাহু দরে আমাকে একটি কক্ষে নিয়ে যায়। তারা আমাদের এক-একজনকে এক একটি গ্রুপের হাতে তুলে দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ ও টর্চার চালায়। বিষয়টি আমি এভাবে বুঝতে পারলাম যে, আমার কানে কখনও ফিরোজের, কখনও মকবুল জানের, কখনও মুদ্দাসসির ও মাসাররাতের আবার কখনও আব্বাজানের চিৎকারের আওয়াজ আসছিল। রাতভর আমাদের উপর চরম

নির্যাতন চালানো হয়। মওসুমটা ছিল শীতের। বরফপাতও হচ্ছিল। আমাদেরকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে সিমেন্টের মেঝেয় শুইয়ে দিয়ে মারপিট করা হয়। আরও অস্ত্রের ডিপো এবং অন্যান্য মুজাহিদদের ঠিকানা বলার জন্য আমাদের উপর এই নির্যাতন চালানো হয়।

পরদিন আমাকে অন্য একটি কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। অনুমান করলাম, আব্বাজান এই কক্ষে আছেন। তাকে নানা প্রশ্ন করা হচ্ছিল আর তিনি উত্তর দিচ্ছিলেন। আমার চোখ-মুখ ঢাকা। হাত পিঠমোড়া করে বাঁধা। আব্বাজানের কণ্ঠ চিনতে পেরে আমি শুধু এতটুকু বললাম, আব্বাজান আমি শাকীল, আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছি।

কথাটা আমার মুখ থেকে বের হওয়ামাত্র আমার ঘাড়ে প্রচণ্ড এক লাথি এসে পতিত হয়। আমি আহ! বলে চিৎকার করে উঠি। আমার আহ চিৎকার আব্বাজানের কলিজা বিদীর্ণ করে দেয়। তিনি আপত্তি উত্থাপন করে বললেন, তোমরা আমাদের এমনভাবে নির্যাতন করছে কেন? অমনি ঠক্ করে একটি শব্দ হয়। সঙ্গে-সঙ্গে আব্বাজানের মুখ থেকে আহ! বেরিয়ে আসে। তারপরই তিনি কালেমা শাহাদাত পাঠ করেন। আমি অনুমান করলাম, তার মাথায় বন্দুকের বাঁট দ্বারা আঘাত করা হয়েছে। কক্ষে কিছু সময় নীরবতা বিরাজ করে। তারপর কারো ভেতরে প্রবেশ করার শব্দ শুনতে পেলাম। ভেতরে ঢুকেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কী হচ্ছে? জবাব হলো, এ লোকটি অজ্ঞান হয়ে গেছে। আগন্তুক একজন অফিসার। তিনি আব্বাজানের শিরা দেখে বললেন, লোকটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। একে অন্যত্র নিয়ে যাও। আব্বাজানকে এই কক্ষ থেকে বের করে অন্য কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়।

আমাকেও এই কক্ষ থেকে বের করে নেওয়া হয়। রাখা হলো একটা ঘোড়ার আস্তাবলে। আমার ভগ্নিপতি এবং ভাগিনা মুদ্দাসসিরকেও এখানে নিয়ে আসা হলো। আমাদের সকলের শরীর বিবস্ত্র। জায়গাটা অত্যন্ত দুর্গন্ধ। প্রচণ্ড শীতে ঠকঠক করে কাঁপছি আমরা সবাই। তার উপর জখমের যন্ত্রণা তো আছেই। লাগাতার আট দিন পর্যন্ত অত্যাচার বলতে থাকে।

টর্চারের সময় আমার উপর এই বলে বেশি নির্যাতন করা হয় যে, প্রথম গ্রেফতারের সময় তুই এই আস্তানা সম্পর্কে বলনি না কেন? তার

অর্থ তুই আমাদের থেকে তথ্য গোপন করেছিস। এখন এরূপ আরও একটি আস্তানার কথা বলে দে, আমরা তোকে ছেড়ে দেব। অন্যথায় তোর পরিণতিও তোর বাপের মতোই হবে।

আমি অজ্ঞাত প্রকাশ করি এবং কোনো মিলিট্যান্ট সম্পর্কে আমার জানা-শোনা আছে বলে অস্বীকার করি। এবার আমাকে কোয়ার্টার গার্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। একটি -একটি কক্ষ। মেঝেতে বালি বিছানো। বালিগুলো পানিতে ভিজে আছে। ছাদ গলিয়ে পানি পড়ছে। বরফপাতের কারণে কক্ষটি একটি বরফডিপোতে পরিণত হয়ে আছে।

এখানে আমার সঙ্গে আমার ভগ্নিপতি মকবুল জান, তার পুত্র মুদ্দাসরি, আলতাফ খান, ফিরোজ বেগকে আঠারো দিন রাখা হয়। তারপর আমাদের পাপাটু পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

পাপাটুতেও আমাদেরকে নতুন করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। আমাদের চোখ থেকে শুধু খাওয়ার সময় পট্টি খুলে দেওয়া হতো। খাওয়া শেষ হওয়ামাত্র আবার পট্টি বেঁধে দেওয়া হতো। লাগাতার চোখ বাঁধা থাকার কারণে চোখের জ্যোতি কমে যায়। এখানে কয়েক দিন রাখার পর আমাদের মুক্তি দেওয়া হয়। রিলিজ করার সময় এক অফিসার আমাকে বলল, দুঃখের বিষয়, তোমার পিতা হার্ট এ্যাটাক করে মারা গেছেন।

আমি বললাম, আপনার কথা সত্য নয়। আব্বাজানকে আমার সম্মুখে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। বন্দুকের বাঁট দ্বারা তার মাথায় আগাত করা হয়েছিল। আপনি কী করে বললেন, তিনি হার্ট এ্যাটাক করে মারা গেছেন?

অফিসার আমার কথার কোনো জবাব দিলেন না। আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা আলুচাবাগ এসে পৌঁছি। এখানে এসেও পিতা ইউসুফ বেগের শাহাদাতের কথা জানতে পারি।

বেলাল আহমাদ বেগ

আমি তেমন শিক্ষিত নই। লেখাপড়া বেশি করতে পারিনি। তবে আল্লাহ বুদ্ধি-বিবেক বেশ দিয়েছেন। আল্লাহ আমাকে দ্বীনের খাতিরে কুফরের বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়ার এবং স্বদেশের আযাদির জন্য লড়াই করার তাওফীক দিয়েছেন বলে আমি বেশ গর্বিত। আসল-নকল ও সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করার জ্ঞান আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন।

আমি বরাবরই প্রচলিত রাজনীতি থেকে দূরে অবস্থান করেছি। আমার বিশ্বাস, এই রাজনীতি দ্বারা জাতির কল্যাণ সাধন ও দ্বীন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তবে মুসলিম মুত্তাহাদা মাহাযের নির্বাচনে অংশগ্রহণের ঘোষণাকে আমি এজন্য স্বাগত জানিয়েছি যে, দলটির নির্বাচনি ইশতেহার আমার মনঃপুত হয়েছিল। তাই ১৯৮৭ সালে নির্বাচনে অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে আমিও নির্বাচনি তৎপরতায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি। নির্বাচনের পর যখন সংগঠনের নেতা-কর্মীদের ধড়পাকড় শুরু হয়ে যায়, তখন এক পর্যায়ে আমাকেও নিরাপত্তা হেফাযতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং শেরগড়ি থানায় আটক রাখা হয়।

এখানে আমার সঙ্গে শুধ নির্মম আচরণই নয়, বরং চরম অবমাননাকর আচরণও করা হয়। তখন আমার সঙ্গে মোহাম্মাদ রমযান রাথের, হাবীবুল্লাহ খান, তার পুত্র ও মোহাম্মদ আবদুল্লাহ বাঙ্গরোসহ আরও কতিপয় যুবক আটক ছিল। আমরা একত্রিত বসে পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা জুড়ে দিলাম।

একজন বলল, অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠবে না। জবাবে আমি বললাম, সোজা আঙ্গুলে ঘি কখনওই ওঠে না। ঘি তুলতে হলে আঙ্গুল বাঁকা করতেই হবে। আমরা কি পারি না আঙ্গুল বাঁকা করতে?

আমরা কি এমন কোনো পদক্ষেপ হাতে নিতে পারি না, যা দ্বারা ভারতের কবল থেকে রক্ষা পেতে পারি? ওরা তো আমাদের ভোটের অধিকারও ছিনিয়ে নিয়েছে। ঘটনাক্রমে থানার অন্যান্য কক্ষের যুবকরাও একই ধারার চিন্তা করছিল। ফলে বের হয়েই আমরা পরস্পর মতবিনিময় করে ঐকমত্যে পৌঁছতে সক্ষম হলাম।

আমি ছিলাম সংসারী মানুষ। সংসার পরিচালনায় পিতার সহযোগিতার জন্য উপার্জনের চিন্তাই ছিল আমার বড় কাজ। সে জন্য বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে বিষয়টি নিয়ে বেশি দূর আর এগুতে পরিনি। কিন্তু একপর্যায়ে যখন যুবকরা সীমান্তের ওপারে যাওয়া-আসা শুরু করে, তখন আমি আমার বাল্যবন্ধু হেলাল আহমাদ বেগের সঙ্গে যোগাযোগ করি। হেলাল বেগ জিহাদের জন্য অবিবাহিত যুবকদের বিশেষভাবে প্রস্তুত করছিল। সংসারীদের সহজে নিতে চাচ্ছিলেন না। তথাপি আমিসহ আরও কয়েকজনের পীড়াপীড়িতে আমাদের ওপারে পাঠাতে সম্মত হয়।

আমরা রওনা হয়ে যাই। জাবেদ আহমাদ শালাহ সীমান্ত পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আমাদেরকে গাইডের হাতে তুলে দিয়ে ফিরে যান। ছয় সপ্তাহ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আমরা সশস্ত্র অবস্থায় কাশ্মিরে ফিরে আসি এবং কাশ্মিরের আযাদি মিশন নিয়ে কাজ শুরু করে দেই। আমাদের লক্ষ্য, ইসলামের জন্য আযাদি অর্জন করা। এই টার্গেটের উপরই আমাদের কার্যক্রম চলতে থাকে।

১৯৯০ সালের মে মাসে হঠাৎ একদিন আমি গ্রেফতার হয়ে যাই। ভারতীয় পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করে পাপাভন পাঠিয়ে দেয়। এখানে আমাকে রাখা হয় মাত্র দুঘণ্টা। কিন্তু এই দু-ঘণ্টায় আমার সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে, তা বলে বোঝাবার মতো নয়। তারপর আমাকে এক-এক সময় এক-এক স্থানে রাখা হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদের নামে নির্যাতন চালানো হয়।

১৯৯২ সালের ১০ সেপ্টেম্বর আমাকে ভয়ানক মিলিট্যান্টের তালিকাভুক্ত করে মধ্যপ্রদেশের জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই জেলে ১৪ মাস পর্যন্ত আমাকে ডেথ সেলে রাখা হয়। তারপর নাহিদা সোজের অপহরণের বিনিময়ে মুক্তি দেওয়ার পরিবর্তে আমাকে হেরানগর জেলে স্থানান্তর করা হয়। এই হেরানগর জেলে আমাকে ছয় মাস কাটাতে হয়।

তারপর দোরায়ে সোয়ামীর ডিমাণ্ডে আমাকে শ্রীনগর স্থানান্তর করা হয়। শ্রীনগর সেন্ট্রাল জেলে কিছুদিন রাখার পর তাহের মীরের সঙ্গে চোখে পট্টি বেঁধে আমাকে হরিনওয়াস পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়। হরিনওয়াস নতুন করে আমার ইন্টারোগেশন করা হয়। চলে নানা রকম নির্যাতন। লাগাতার কদিনের জিজ্ঞাসাবাদ ও নির্যাতনে আমি চরমভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ি। অসুস্থ অবস্থায় কাটাই ষোলো দিন। এখানে আমাকে আড়াই মাস রাখা হয়। তারপর অন্যান্য সাথীদের সঙ্গে আমাকে আবার শ্রীনগর সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বামনার আন্ডারগ্রাউণ্ড হানা দিয়ে সমস্ত অস্ত্র, উপস্থিত সকল মুজাহিদ ও ঘরের সব পুরুষকে নিয়ে যাওয়ার পর এখন ঘরে আছি আমি আর আমার কন্যা সায়েমা। আমরা মা-মেয়ে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের একটি কোম্পানী দ্বারা অবরুদ্ধ। আমাকে তারা ঘরের একস্থানে এমনভাবে বসিয়ে রেখেছে যে, এখান থেকে একচুলও নড়াচড়া করার অনুমতি নেই। আগের কোম্পানী আমার মাথার ওড়না কেড়ে নিয়েছিল। আমি অন্য কক্ষে গিয়ে মাথা ঢাকার জন্য কোনো কাপড় আনতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু অনুমতি পেলাম না।

আমি আমার অবুঝ কন্যাকে বুকে জড়িয়ে ধরে গ্রেফতারকৃত মুজাহিদ ও পরিবারের সদস্যদের কথা ভাবছি যে, হায়েনারা যেন তাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করছে। এমন সময় কোম্পানীর এক-একজন সিপাহী ও অফিসার আমার নিকট এসে আমাকে দেখে-দেখে চলে যেতে লাগল– যেন আমি প্রদর্শনের জন্য রাখা কোনো আজব প্রাণী। আমাকে দেখার জন্য রীতিমতো লাইন লেগে যায়। অবস্থা দেখে আমি দু-হাটুর মাঝে মুখ লুকিয়ে ফেলি। তারা অকথ্য ভাষায় আমাকে যা-তা বলতে শুরু করে। কেউ আমাকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করছে, কেউ চিবুক ধরে মাথাটা উপরে তুলে মুখের দিকে তাকিয়ে বলছে আহ! কী রূপ রে! একেকজন একেক কথা বলছে– 'দেখ, কেমন নির্দোষ সেজে বসে আছে, যেন কিছুই বোঝে না। অথচ কত ভয়ংকর নারী।' 'আরে এ তো নারী নয়– নাগিনী।' 'কে জানে ডাইনীটা তার মিলিট্যান্টদের হাতে আমাদের কত জওয়ানকে হত্যা করিয়েছে।' 'মন চায় মহিলার মুখ খাবলে দেই।' 'অনুমতি পেলে

আমি ওর ওপর আমার সমস্ত মেগজিন খালি করে ফেলতাম।' ইত্যাদি আরো অনেক রকম অসহনীয় মন্তব্য।

বিএসএফ-এর জওয়ানরা রাতভর আমার গায়ে এভাবে বিষাক্ত শর বর্ষণ করতে থাকে। তারা আমার ব্যক্তিত্বকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলে। আমি ধৈর্যের সাথে মনে -মনে আল্লাহর কালাম পাঠ করতে থাকি।

আমি মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকি, 'হে আল্লাহ! আপনি আমার সাহস অটুট রাখুন এবং এই কঠিন পরীক্ষায় আমাকে উত্তীর্ণ করুন। আমাকে ও আমার মাছুম কন্যাকে হেফাযত করুন।' আমি আল্লাহর নিকট আরজ পেশ করি, এ মুহূর্তে আমার হেফাযতের জন্য কোনো ফেরেশতা প্রেরণ করুন।

আমরা গতকাল সন্ধ্যায় শুধু পানি পান করে ইফতার করেছিলাম। আর এখন খাবার প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও শুধু এক গ্লাস পানি পান করে রোযার নিয়ত করলাম।

মসজিদে ফজরের আযান হলো। আমরা নামাযের জন্য অজু করলাম। নামাজ আদায় করার পর সায়েমা বলল, মা, আমি বাথরুমে যাব। আমি তাকে পুরোপুরি ফর্সা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বললাম। মেয়েটা সকাল আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে এবার বলল, মা আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তুমি আমাকে বাথরুমে নিয়ে চলো।

মেয়ের অবস্থা দেখে আমি অস্থির হয়ে পড়ি। ঘরের সর্বত্র সিপাহীরা গিজগিজ করছে। তাদের বর্তমানে আমি মেয়েকে টয়লেটে নিয়ে যাওয়া সমীচীন মনে করলাম না। কিন্তু না গিয়েও যে উপায় নেই।

হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। আমি এক সিপাহীকে বললাম, আমি তোমাদের ইনচার্জ অফিসারের সাথে দেখা করতে চাই। সিপাহী ধারণা করে, আমি অফিসারের নিকট তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পেশ করব। সে আমার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেয় যে, তুমি অফিসারের সঙ্গে কেন সাক্ষাৎ করবে? এ সময় অপর এক সিপহী বাইরে গিয়ে অফিসারকে নিয়ে আসে। এসেই অফিসার আমাকে জিজ্ঞেস করে, কী ব্যাপার?

আমি বললাম, আমার মেয়ে বাথরুমে যেতে চায়, কিন্তু তোমার এই সিপাহীরা...। অফিসার বলল, ঠিক আছে, নিয়ে যাও। অফিসার সব

সিপাহীকে বাইরে বের করে দিয়ে আমাকে বলে দেয়, ভিতর থেকে বাথরুমের দরজা বন্ধ করবে না।

আমি সায়েমাকে বাথরুমে নিয়ে গেলাম। ওকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজে বাইবে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে থাকি। মনে বড় ভয় লাগছিল। কিন্তু আল্লাহর রহমতে কোনো অঘটন ঘটেনি।

মেয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলে সিপাহীদের অনুপস্থিতিতে আমি ভাবলাম, এই সুযোগে বেডরুমে গিয়ে মাথা ঢাকার জন্য কিছু নিয়ে আসি। বেডরুমে গিয়ে দেখি, আমার স্বর্ণালংকারের ডিব্বাটা শূন্য নীচে পড়ে আছে। ওয়ার্ডরব-এর দরজা খোলা। একটা লেদার ব্যাগে টাকা ছিল, সেটাও খালি পড়ে আছে।

আমি পাগলের মতো সেই কক্ষ থেকে বের হয়ে অন্য কক্ষে ঢুকি। সেখান থেকে আরেক কক্ষে। কিন্তু ঘর আমার শূন্য। কিছুই নেই। বিছানাপত্র আর কাপড়-চোপড় ছাড়া সব উধাও। মটর সাইকেল, বাইসাইকেলও নেই। কাপড় ধোঁওয়ার মেশিন এবং ফ্রিজও লাপাত্তা। নজিরবিহীন এক ডাকাতির ঘটনা ঘটে গেছে আমার ঘরে।

লুটপাটের এই চিত্র দেখে আমি স্থির থাকতে পারলাম না। আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, ওরে সন্ত্রাসীরা, দস্যুরা, বদমাশরা, তোরা আমার সবকিছু লুটে নিয়েছিস! তোরা যদি মুজাহিদ ধরতে আর অস্ত্র নিতেই এসে থাকিস, তা তো তোরা পেয়েছিস। কিন্তু আমার ঘরের সব জিনিসপত্র, সোনা-দানা, টাকা-পয়সা লুট করলি কেন? তোরা আমাকে ভিখারীতে পরিণত করেছিস। তোরা আমাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ আরোপ করেছিস। শোন সন্ত্রাসীরা! শোন দস্যুরা! আমরা নিজেদের অধিকার-ই দাবি করছি। তোরা যদি তোদের ওয়াদা পূরণ করতে, তাহলে আমাদের ভারতের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে হতো না। অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়ার জন্য তোরাই আমাদের বাধ্য করেছিস। নিজের স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র ধারণ করা অপরাধ নয়। আমরা আমাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করছি। এখানকার সব মানুষ নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-শিশু সবাই স্বাধীনতা চায়। আযাদি আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য। এই অধিকারকে আমরা শত্রুর হাতে তুলে রাখতে পারি না।

আমি আরও কত কী বললাম আল্লাহ জানেন। এমন সময় এক অফিসার আমার কথা কেটে বলে উঠল, তুমি খুব বেশী কথা বলছ। তোমার ঘর থেকে এতগুলো অস্ত্র উদ্ধার করা হলো, বলো তো এসব অস্ত্র দ্বারা কতজন জওয়ানকে হত্যা করেছ? আরও কতজন হত্যা করতে?

আমি সঙ্গে -সঙ্গে বলে উঠলাম, 'আর তোমাদের কাছে এই যে অস্ত্র আছে, এগুলো দ্বারা আমাদের শুধু সশস্ত্র যুবকরাই নয় – নিরস্ত্র বৃদ্ধ, শিশু এবং অবলা নারীরা প্রতিদিন-ই তো খুন হচ্ছে। আমাদের নিরপরাধ লোকদের রক্তে তোমাদের হাত রঞ্জিত হয়ে আছে। তোমরা পাপিষ্ঠ, লুটেরা, ঘাতক। আসল সন্ত্রাসী তো তোমরাই।'

আমার চিৎকার ও বক্তব্য শুনে চারপাশে অনেক সিপাহী ও কয়েকজন অফিসার জড়ো হয়ে যায়। এক সিপাহী আমাকে প্রহার করার জন্য হাত তুলে সামনে এগিয়ে আসে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে বড় অফিসার এগিয়ে এসে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, সর, ওকে বলতে দাও। কী বলছে ও?

এমন সময়ে অপর এক অফিসার আমার নিকট এল। সে অন্যান্য অফিসার ও সিপাহীদের সরিয়ে দিয়ে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, আপনি কি বলতে পারেন, আপনার কী-কী খোয়া গেছে এবং কত ক্ষতি হয়েছে? আপনার ঘর থেকে কী-কী জিনিস তুলে নেওয়া হয়েছে?

আমি বললাম, ঘরে আমার আছে-ই বা কী, বিছানাপত্র আর পরিধানের কাপড় ছাড়া?

অফিসার বলল, নগদ টাকা, সোনা-দানা ও মালামাল ইত্যাদির বিস্ত ারিত বিবরণ দিতে পারবেন?

আমি বললাম, যতটুকু মনে আছে, বলতে পারব। নগদ টাকা কত ছিল বলতে পারব না। কারণ, তা রেখেছিলেন আমার স্বামী। আমি সোনা-রূপা ও অন্যান্য জিনিসপত্রের কথা বলতে পারব।

অফিসার কোমল কণ্ঠে বলল, দেখুন, আপনার প্রতি আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে। কিন্তু আমি আপনার তেমন কোনো উপকার করতে পারব না। কারণ, আমি মুসলমান অফিসার। আপনার পক্ষে কথা বললে অন্যরা মনে করবে, আমি আপনার দলের লোক। আমি শুধু এতটুকু করতে পারি যে, আমি জেনারেল অফিসার কমান্ডারকে আপনার কাছে

নিয়ে আসব। আপনি তাকে সবকিছু খুলে বলবেন। আমার ধারণা, বিষয়টি তার নলেজে গেলে কিছু না কিছু ফেরত পেতে পারেন। তারপরও যদি না পান, তাহলে মনে করতে হবে, আপনার ঘরে কিছুই ছিল না।

আমি বললাম, ঠিক আছে, আপনি তা-ই করুন, আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।

বিএসএফ-এর এই মুসলমান অফিসার যখন আমার সঙ্গে এসব কথা বলছিল, তখন বাইরে অনেক লোক জড়ো হয়ে গেছে। অনেক মহিলা ভেতরে ঢোকার অনুমতি চাচ্ছে। মসজিদ কমিটির এক কর্মকর্তা ফোর্সকে বলছেন, আপনারা কাল রাত থেকে মা-মেয়েকে আবদ্ধ করে রেখেছেন, এখন আমাদের ভেতরে যেতে দিন। আমরা তাদের খবরাখবর নেই। এমন সময় আমার মায়ের কণ্ঠ ভেসে এল। তিনি কাকে যেন বলছেন, আমাকে আমার মেয়ে ও নাতনীর সঙ্গে দেখা করতে দাও, আমাকে ভেতরে যেতে দাও।

আওয়াজ চিনতে পেরে আমি অন্য এক অফিসারকে বললাম, আমার মাকে ভেতরে আসতে দিন।

অফিসার বলল, আপনার মা কে? বাইরে তো অনেক মহিলা।

আমি বললাম, বাইরে গিয়ে বলুন, ফরীদার মা ভেতরে যেতে পারেন।

কিছুক্ষণ পর স্থানীয় কয়েকজন মহিলার সঙ্গে আমার মা ঘরে প্রবেশ করেন। মাকে দেখামাত্র আমি তার গলা জড়িয়ে ধরি। তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। আমি তাকে বারণ করে বললাম, না মা! কাঁদবেন না। আমাদের পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে।

মায়ের সঙ্গে আসা মহিলারা আমার অবস্থা জানতে চায়। জিজ্ঞেস করে, আমার সঙ্গে তারা কোনো অসদাচরণ করেছে কিনা।

আমি তাদেরকে বললাম, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আমাদের ইজ্জত রক্ষা করেছেন। মারধর আর গালি-গালাজকে পরোয়া করি না।

এক মহিলা বলল, আমরা রাতভর তোমাদের চিন্তায় অস্থির ছিলাম। কিন্তু কী করব। বাইরে বের হওয়া তো দূরের কথা, ঘরের জানালা পর্যন্ত খোলার অনুমতি ছিল না। এখন এলাকার মানুষজন ও তোমার আত্মীয়-স্বজন সবাই বাইরে এসে জড়ো হয়েছে।

আমার মা বললেন, বাইরে কয়েকজন সাংবাদিক এসেছে। ফটো সাংবাদিকও আছে। কিন্তু তাদের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।

মা ও প্রতিবেশী মহিলাদের পেয়ে আমার হালে পানি আসে। তারা সবাই মুজাহিদদের গ্রেফতারি ও অস্ত্রের ডিপো বেহাত হয়ে যাওয়ায় আফসোস করছিলেন এবং আমার নিকট ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শুনতে চাচ্ছেন। আমি তাদের ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে বললাম, এটি বিরাট এক দুর্ঘটনা অবশ্যই। আমি একে আমাদের দুর্ভাগ্যই বলব। তবে সাহস হারাবার কোনো কারণ নেই। আজ আমরা তাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছি, আমরা তাদের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। কাল ইনশাআল্লাহ এর বিপরীত ঘটনা ঘটা বিচিত্র নয়। যুদ্ধে এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক।

আমি মাকে বিশেষ এক মিশনে পাঠিয়ে দিই, যেন তিনি অন্যান্য মুজাহিদদের এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন এবং তাদের সাবধান থাকতে বলেন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে এ দায়িত্ব আমি নিজে পালন করতাম। কিন্তু এখন তো আমি অবরুদ্ধ। আমার তো নড়াচড়া করারও অনুমতি নেই।

সন্ধ্যায় ইফতারের সময় এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি পান। তারা আমাদের জন্য ইফতারি ও খাবারের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু আমরা মা-মেয়ে আগেই পানি পান করে ইফতার করে ফেলি। আমরা নামায আদায় করলাম। সবাই আমাদের কিছু খেয়ে নিতে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। কিন্তু আমার মুখে খাবার উঠছে না। ছয়জন মুজাহিদ ও পরিবারের যে সদস্যদের কাল সন্ধ্যায় নিরাপত্তা হেফাযতে নিয়ে যাওয়া হলো, না জানি তারা কী হালে আছে। আমি তাদের চিন্তায় অস্থির। কী জানি তারা এ পর্যন্ত না খেয়ে আছে কিনা। ঠিক এমন সময় সৈন্যরা আমার পুত্র মাসাররাতকে বাড়িতে এনে রেখে যায়। মাসাররাত ঘরে প্রবেশ করে। আমি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরি। জিজ্ঞেস করি, তোর বাবা, অন্য সবাই কেমন আছে? মাসাররাত সংক্ষেপে জবাব দেয়, সব ঠিক আছে, সবাই ভালো আছে।

আমি একজন-একজন করে নাম ধরে -ধরে কে কেমন আছে জানতে চাইলে ছেলে আমাকে নিশ্চয়তা দেয়, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, তারা সবাই

ভালো আছেন। প্রত্যেককে একসঙ্গে রাখা হয়েছে। আমিও তাদের সঙ্গে ছিলাম। আমাকে শিশু মনে করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

মাসাররাতের বক্তব্য শুনে আমি ও সায়েমা খেতে শুরু করি। মাসাররাতকেও খেতে বললাম। কিন্তু সে বলল, আমি খাব না, এইমাত্র খেয়ে এসেছি। আমি পীড়িপীড়ি করলে মাসাররাত বলল, আপনি নিশ্চিন্ত হন, আমরা সবাই একত্রে বসে খানা খেয়েছি। খানা খাইয়েই আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

আসলে মাসাররাত আমাদের মন রক্ষা করার জন্য মিথ্যা বলেছিল। প্রকৃতপক্ষে বিগত দুদিন যাবত সে কোনো খানা-ই খায়নি। সে শুধু সকলের অমানুষিক নির্যাতনই প্রত্যক্ষ করেনি, তার নানাজানের লাশও স্বচক্ষে দেখে এসেছে। পরে সে বলেছিল, বন্দুকের বাঁট দিয়ে নানাজানের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তখন তিনি লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পাঠ করে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। নানার লাশ দেখে এসেও আমাদের অবস্থা দেখে সাময়িকের জন্য সে মিথ্যা বলেছিল, যাতে আমরা শান্তমনে ইফতার করতে পারি ও খানা খেতে পারি।

আমরা যথারীতি সাহরীর সময় পানি পান করে পরদিনের রোযার নিয়ত করি। পরদিন ভোরে একটি কোম্পানী ডিউটির জন্য আসে। আগের কোম্পানী হেড কোয়ার্টারে ফিরে যায়। এ কোম্পানীতে দুজন শিখ অফিসার ছিল। তারা আমার ঘর ও আশপাশের দায়িত্ব হাতে তুলে নিলে আমি শিখ অফিসারদ্বয়কে বললাম, আপনারা এখানে কেন এসেছেন? আগের কোম্পানী তো সবকিছু লুট করে নিয়ে গেছে। এখন আপনাদের নেওয়ার মতো কিছু নেই। একের পর এক কোম্পানী আসার অর্থ কী?

শিখ অফিসার জবাব দেয়, এখন আমরা এই ঘরের ভিটা খুঁড়ে, দেওয়াল ভেঙ্গে গোলা-বারুদ বের করব। এখানে আমরা অনেক কিছু পাব। আমি তাদের সঙ্গে বাদানুবাদে লিপ্ত হলে তারা ওয়াকিটকির মাধ্যমে হেড কোয়ার্টারে সংবাদ জানায়, বহেনজি আমাদের এখানে আসায় আপত্তি তুলছে এবং কঠোর ভাষা ব্যবহার করছে। ওখান থেকে জবাব আসে, ওকে চুল ধরে টেনে-হেঁচড়ে এখানে নিয়ে আস, আমরা তাকে মজা দেখাব।

আমি তাদের নিকট থেকে সরে মায়ের কাছে চলে যাই। মা আমাকে বললেন, থাক, ওদের সাথে কড়া কথা বলিস না। অন্যথায় তারা তোকেও নিয়ে যাবে। নীরবে পরিস্থিতির মোকাবেলা কর, তা-ই ভালো।

বাইরে ধীরে-ধীরে লোকসমাগম বাড়তে থাকে। তারা বিক্ষোভ শুরু করে দেয়। তারা দাবি তোলে, আমাদের মহিলাদের অবরোধ থেকে মুক্ত করো। অন্যথায় আমাদের ভেতরে ঢুকতে দাও।

আমাদের আন্ডার-গ্রাউন্ড থেকে অস্ত্রের ডিপো উদ্ধার হওয়া এবং কয়েকজন মুজাহিদ গ্রেফতার হওয়ার সংবাদ স্থানীয় পত্রপত্রিকা ছাড়াও জাতীয় পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংবাদ ছিল সেদিনের প্রধান আলোচ্য বিষয়। আশপাশ ও দূরদূরান্ত থেকে মানুষ আমাদের খবর জানতে ছুটে আসে। সাংবাদিক এবং ফটোগ্রাফাররাও এসে ভিড় জমায়।

দেশের বিভিন্ন স্থান ও বিভিন্ন অবস্থানের মুজাহিদরা পত্রিকার মাধ্যমেই সংবাদ জেনে ফেলেছে। জাবেদ শালাহ্, আলতাফ, শাব্বির, মোহাম্মাদ সিদ্দীক, হুসাইন ও ফিরোজের গ্রেফতারির সংবাদ ছড়িয়ে পড়ামাত্র তাদের মুক্তির জন্য স্থানে-স্থানে বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায় ও মিছিল বের হয়।

এ রাতও অতিক্রান্ত হওয়ার পর সাহরীর সময় আমরা এক গ্লাস করে পানি পান করে রোযার নিয়ত করি।

এখন দুরাত অতিক্রম করে তার পরের দিন শুরু হয়েছে। সকাল নটা। বামনা থেকে আমাদের এক আত্মীয় মহিলা এসে সংবাদ বলে, এ ঘরের মালিক মারা গেছে। আমরা অস্থির হয়ে পড়ি। কক্ষে উপস্থিত সব মহিলা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

'এ ঘরের মালিক মারা গেছে' শুনে প্রথমে আমার মন ধাবিত হয় মকবুল জানের প্রতি। কারণ, আমার স্বামী মকবুল জানই তো এ ঘরের মালিক। আব্বাজানের কথা চিন্তাও করিনি।

কক্ষে আমার মা, মেয়ে সায়েমা ও আরো কয়েকজন মহিলা বুক চাপড়ে কাঁদছেন। আমি কিছু সময় আত্মভোলার মতো বসে থাকি। পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে হাঁটা দিই। কিন্তু কেউ আমাকে বাধা দিল না। না কোনো সিপাহী বা অফিসার জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছ?

আমি সোজা কোম্পানীর কমান্ডারের নিকট গিয়ে বললাম, আমি কন্ট্রোল রুমে গিয়ে ওখান থেকে আমার স্বামীর লাশ আনতে চাই। এক্ষুনি আমার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করুন।

সে সময়ে আমার বাড়ির সামনে অনেক মানুষের ভিড় ছিল। তাদের কেউ আমাকে চিনে, কেউ চিনে না। তারা এসেছে ফরীদা আপাকে দেখার জন্য। আমি বের হওয়ামাত্র তারা যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

এ মুহূর্তে আমার ঘরে কিছুই নেই। আমার সর্বস্ব লুট হয়ে গেছে। স্বামী মারা গেছেন। ভাই-পুত্র ও দেশের মুক্তি আন্দোলনের মুজাহিদরা ইন্টারোগেশন অতিক্রম করছে। আমি এখন একা ও নিঃস্ব।

এক পুলিশ কর্মকর্তা আমাকে তার গাড়িতে তুলে কন্ট্রোল রুমে নিয়ে যায়। আমি কন্ট্রোল রুমে গিয়ে উপনীত হই। একটা ট্রাকে লাশ রাখা আছে। আমি ট্রাকে চড়ে স্বামীর লাশ দেখার জন্য লাশের উপর থেকে চাদরটা সরিয়ে ফেলি। কিন্তু এ কী! এ তো আমার স্বামীর নয় – পিতা ইউসুফ বেগ-এর লাশ। আমার সেই রুগ্ন বৃদ্ধ পিতার লাশ, যার ব্যাপারে আমার আশা ছিল, লোকটির স্বাস্থ্য ও বয়সের প্রতি রক্ষ্য রেখে ওরা তাকে ছেড়ে দেবে। কিন্তু...।

পিতার লাশ দেখে আমার মনে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা লাগে। আমার চোখের সামনে সবকিছু অন্ধকার হয়ে যায়। মাথায় কে যেন হাতুড়িপেটা করতে শুরু করে। কলিজাটা চুরমার হয়ে যায়। তবে অল্পক্ষণের মধ্যেই আত্মসংবরণ করে পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞেস করলাম, এই লাশ ছাড়া অন্য কোনো লাশ আছে কি? বলল, এ পর্যন্ত কন্ট্রোল রুমে এই একটি লাশই এসেছে।

আমি এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলাম, আত্মীয়-স্বজনদের কেউ আছে কিনা। দেখলাম, মামা আছেন, যিনি আমার আগেই এসে পৌঁছেছেন। আমি আমার পিতার লাশ নিয়ে রওনা হলাম। ড্রাইভারকে বলে দিলাম, আমাদের আলুচাবাগ পৌঁছিয়ে দাও।

আমাদের সঙ্গে পুলিশ ছিল। শহীদের মৃতদেহ যখন আলুচাবাগ পৌঁছে, তখন বাড়িটা লোকে লোকারণ্য। পুরুষ-মহিলা-বৃদ্ধি-শিশু সবাই আছে। নেই শুধু শহীদের তিন পুত্র, দুই নাতী ও জামাতা। অর্থাৎ শহীদের

পরিবারের পুরুষদের কেউই নেই। কাঁধে করে পরজগতে রেখে আসার জন্য ইউসুফ বেগ-এর আপন বলতে কেউ নেই। আমি পিতার মৃত্যুতে হা-হুতাশ করার পরিবর্তে পুত্র, ভাই ও স্বামীর লাশের অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত হয়ে আছি আর ভাবছি, পিতার লাশের পর না জানি এবার কার লাশ আসে! যে জালিমরা বৃদ্ধ ও রুগ্ন পিতাকে রেহাই দিল না, তারা যুবক ও বালকদের ছাড়বে কেন?

আমি মায়ের মুখোমুখি হতে পারছিলাম না। তাকে আমি সান্ত্বনা দিতে পারছিলাম না। নিহত বাবাকে নিয়ে আমার ভাববার ফোরসত নেই। আমার অপেক্ষা আরও লাশের, উৎকণ্ঠা মুজাহিদদের নিয়ে, তারা যার অবস্থান বদল করে নিরাপদে অবস্থান নিল কিনা! আমি কন্ট্রোল রুমের সংবাদের অপেক্ষা করছি এবং ভাবছি, কে জানে এবার ওখান থেকে কার লাশ নিয়ে আসতে হয়।

কিন্তু পিতার জানাযা ও কাফন-দাফন পর্যন্ত আর কোনো সংবাদ আসেনি। আমি নিজেই পিতার লাশের খাটিয়া কাঁধে তুলে নিই। লোকেরা আমাকে বারণ করল। প্রচণ্ড বরফপাতের মধ্যেও হাজার-হাজার মানুষ উপস্থিত। খাটিয়া কাঁধে নেওয়ার লোকের অভাব নেই। কিন্তু এ মুহূর্তে আমি যেন নারী নই – পুরুষ। পুত্র ও জামাতার অভাব পূরণ করার জন্য আমি খাটিয়া কাঁধে নিই। লাশটা কবরস্তান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে আমি ফিরে আসি।

শরীয়তে সিদ্ধ না হলেও আমাদের সমাজে 'চারদিনা' পালনের প্রথা রয়েছে। আমি এসবের কোনো গুরুত্ব দেই না। পিতার 'চারদিনা' পালনেরও আমার ইচ্ছে ছিল না। কারণ, কাজটা একে তো অনর্থক, দ্বিতীয়ত আমার ভাবনা ও উৎকণ্ঠা বন্দীদের নিয়ে। কে বলবে কখন কার লাশ এসে হাজির হয়। তৃতীয়ত এ মুহূর্তে আমি কপর্দকশূন্য। আমি বেজায় অস্থিরতার মধ্যে সময় অতিবাহিত করছি। এমন সময় এলাকার এক ব্যক্তি কিছু টাকা আমার হাতে তুলে দেয়। গুণে দেখি, ত্রিশ হাজার। আমি দশ হাজার টাকা রেখে বাকি টাকা ফিরিয়ে দিলাম। বললাম, আল্লাহ আপনাকে জাবায়ে খায়ের দান করুন। আমার আপাতত দশ হাজার টাকাই যথেষ্ট। আমি হালুয়া-রুটি প্রস্তুতির কাজে আত্মনিয়োগ করলাম।

আগামীকাল পিতার 'চারদিনা' অনুষ্ঠান। সকাল ৯টা ফাতেহাখানির সময় নির্ধারিত। সন্ধ্যায় ইফতারের সময় মসজিদ থেকে ঘোষণা এল, কন্ট্রোল রুমে চারটি লাশ এসে পৌঁছেছে। স্বজনরা শনাক্ত করে নিয়ে আসুন।

আমি কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। আমাদের কে কে হতে পারে? আমি আত্মসংবরণ করে বোরকাটা গায়ে জড়িয়ে কন্ট্রোলরুমে যাওয়ার জন্য উদ্যত হই। কিন্তু আমাকে বাধা দেওয়া হলো। আমি আর গেলাম না। মহল্লার কিছু লোক গিয়ে খোঁজ নিয়ে এসে বলল, লাশের মধ্যে বেগ পরিবারের কেউ নেই। বামনা থেকে যে মুজাহিদদের গ্রেফতার করা হয়েছিল, তাদেরও কেউ নয়।

আমি আশ্বস্ত হতে পারলাম না। আমার মস্তিষ্ক বেকার হয়ে আছে। আমি ভাবনার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছি।

পরদিন ভোর থেকেই লোকদের আগমন শুরু হয়ে যায়। অনুষ্ঠানটা আগাগোড়া আমাকেই পরিচালনা করতে হবে। শুধু অন্দর মহলেই নয় – পুরুষ মহলেও আমাকে যাওয়া-আসা করতে হচ্ছে। আমার একপা একঘরে তো অপর পা আরেক ঘরে।

অনুষ্ঠানে বেশকিছু মুজাহিদও উপস্থিত হয়েছে। বিভিন্ন মুজাহিদ পরিবারের অনেক সদস্য এবং আত্মীয়-স্বজনরা এসেছে। বিভিন্ন জিহাদি সংগঠনের অন্তত পঁচিশজন মুজাহিদ দেখে আমি শংকতি হয়ে পড়লাম, পাছে এখানে হানা পড়ে যায় কিনা।

এমন সময় আমি নারী মহলে ঢুকে দেখি, আমার মাকে ঘিরে বসে আপন-প্রতিবেশী কয়েকজন মহিলা আমার বিরুদ্ধে নানারকম মন্তব্য করছে–

"তোমার এমন স্বচ্ছল পরিবারটার কী হয়ে গেল! কার চোখ পড়ে গেল!

তোমার কিসের অভাব ছিল! এ ঘর থেকে কত অভাবী-অসহায় মানুষের অভাব পূরণ হতো!

ঘরে চাল-ডাল খেয়ে কতই-না সুখে ছিলে, আর আজ...!

খামোখা একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লে!

স্বাধীনতাকামী কে নয়? আমরাও তো স্বাধীনতাকামী। কিন্তু আমরা আমাদের গৃহকে মুজাহিদদের আখড়া বানাতে দিইনি। মুজাহিদদের ঘরে জায়গা দিলে এই পরিণতিই হয়!

মুজাহিদদের সাহায্য কর ভালো কথা, কিন্তু নিরাপদ দূর থেকে। তাদেরকে ঘরে স্থান দেওয়া বিপদ ডেকে আনার শামিল। দেখলেনই তো আপনার পরিবারটার কী দশা হলো!

'গৃহকর্তা খুন হলেন। অন্য পুরুষরা বন্দী। আল্লাহ জানেন তাদের কী অবস্থা!'

'হিন্দুস্তানী ফৌজের সঙ্গে লড়াই করা সহজ কথা নয়। ফৌজের সঙ্গে ফৌজই লড়াই করতে পারে!'

'প্রতিদিন কত লোক মারা যাচ্ছে, কত ঘর-বাড়ি আগুনে পুড়ছে! এ পর্যন্ত এই আন্দোলন দিয়ে লাভটা কী হয়েছে?'

এ সমস্ত মন্তব্য শুনে আমি হতভম্ব হয়ে যাই। কথাগুলো আমার হৃদয়ে বিষাক্ত তীরের মতো বিদ্ধ হচ্ছিল। যেখানে আমাদের সান্ত্বনা দেওয়া দরকার, সেখানে কিনা মাকে ঘিরে বসে মহিলারা কলিজায় শর বিদ্ধ করছে। আমি অত্যন্ত মর্মাহত হলাম। আল্লাহর নিকট ধৈর্য ধারনের তাওফীক কামনা করলাম। কিন্তু সহনশক্তি যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল, আমি আর চুপ থাকতে পারলাম না। আমি আবেগাপ্লুত হয়ে তাদের উদ্দেশে বললাম–

"আমি উপস্থিত সম্মানিতা মহিলাদের উদ্দেশে কিছু কথা বলতে চাই। বিশেষত সেই মহিলাদের উদ্দেশে, যারা আমার মায়ের চারপাশে উপবিষ্ট আছেন। আমি জানি, আপনারা সবাই আমাদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করতে এসেছেন। আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ আপনাদের নিরাপদ ও সুখে রাখুন। কিন্তু পাশাপাশি আমি একটি দুঃখজনক বিষয়ও প্রত্যক্ষ করছি। আমি আজ তিন দিন যাবত লক্ষ্য করছি, আমাদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশার্থে আগত কিছু লোক বিশেষত কতিপয় মহিলা সমবেদনা প্রকাশের আড়ালে আমাদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিচ্ছেন। তারা নানাভাবে আমাদের চিন্তা-চেতনায় আঘাত হানার চেষ্টা করছেন। সোজা কথায়, তারা ইনিয়ে-বিনিয়ে জিহাদ ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে কথা

বলছেন, যা সহ্য করা আমার সাধ্যের অতীত। স্বাধীনতা আন্দোলন ও জিহাদ-মুজাহিদদের বিরোধী বক্তব্য নীরবে সহ্য করা আমার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। কাজেই কারো সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির পরোয়া না করে আমি বলতে চাই, আমাদের এই আযাদি আন্দোলনে যাদের সমর্থন নেই, তারাই কথায়-কথায় এর বিরোধিতা করে থাকেন। যাদের বাপ-ভাই-পুত্র-স্বজন কেউ শহীদ হয়নি, তারাই বেশী প্যাঁচাল পাড়েন। যাদের গৃহ লুণ্ঠিত হয়নি, তারাই নিজের ঘরের দরজা মুজাহিদদের জন্য বন্ধ করে রাখেন। মনে রাখবেন, যেকোনো আন্দোলনে উত্থান-পতন একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। আমাদের এই আন্দোলনও যে সফলতা লাভ করবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এর পরিণতি উলটোও হতে পারে। তবে আমি পূর্ণ আশাবাদী যে, ভারতকে একদিন না একদিন কাশ্মির ছাড়তেই হবে। সেই দিনটি কবে আসবে কেউ বলতে পারবে না। সেই দিন কাশ্মিরে কত মানুষ বেঁচে থাকবে, তাও বলতে পারি না। মনে রাখবেন, আযাদি কুরবানি চায়। আযাদির এ লাড়াইয়ে আমরা এমন একটি জাতির মুখোমুখি, যারা ইসলাম ও মুসলমানদের ঘৃণ্যতম দুশমন।

আমি আগেও বলেছি, আজও বলছি, এখনও কিছুই হয়নি। সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন পিতামাতার চোখের সামনে সন্তানকে জবাই করা হবে। পিতার সম্মুখে কন্যার, ভাইয়ের সম্মুখে বোনের সম্ভ্রমহানি করা হবে। আমার বাড়ি-ঘর ও পরিবারের দৃষ্টান্ত তো আপনাদের চোখের সামনেই রয়েছে। আমার পিতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। স্বামী, তিন ভাই ও দুই পুত্রের কী অবস্থা, তাদের পরিণতিইবা কী হবে, জানি না। আমার সর্বস্ব লুণ্ঠিত হয়েছে। আমার মাথার ওড়না কেড়ে নেওয়া হয়েছে। লাখ টাকার মালিক আজ পিতার 'চারদিনা' পালনের জন্য ঋণ নিতে বাধ্য হয়েছি। ক্রন্দন-হাহুতাশ ও আফসোস করার প্রয়োজন তো ছিল আমার। কিন্তু কাঁদছে তারা, যাদের হাতের তালুতে একটা অঙ্গারও রাখা হয়নি।

আযাদি আন্দোলনের বিরোধিতা ঐসব সুহৃদ পুরুষ ও মহিলারা করছেন, যারা এই আন্দোলনকে দূর থেকে দেখছেন আর নিজেদের সন্ত ান-স্বজনদের ফৌজ ও ফোর্সের ছায়া থেকে নিরাপদ রাখার পন্থা অবলম্বন করছেন। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, এই যে মুজাহিদ, যাদের সম্পর্কে

বলা হচ্ছে, আমি যদি তাদের সঙ্গ না দিতাম, তাহলে আমার এই পরিণতি ঘটত না, তারা কি এসব তাদের আরাম-আয়েশের জন্য করছে? বলুন, জবাব দিন। তারাও মা, যারা নিজ সন্তানদের নিরাপদ রাখার জন্য আঁচল তলে আগলে রাখেন। আবার এমনও মা আছেন, যারা ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতের স্বার্থে কলিজার টুকরো সন্তানদের নিজহাতে সাজিয়ে জিহাদ করার জন্য ময়দানের উদ্দেশ্যে রওনা করিয়ে দেয়।

যেসব মা নিজ সন্তানদের নিরাপদ রাখার পন্থা খুঁজে বেড়ান, তারাই মুজাহিদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দোষ-ক্রটি নিয়ে মাতামাতি করেন। আমাদের যে সন্তানরা যুদ্ধের ময়দানে অবতরণ করেছে, তারা আমাদের ভবিষ্যৎ ও অনাগত বংশধরদের জন্য নিজের প্রিয় জীবন কুরবান করছে। তারা যেপথ অবলম্বন করেছে, তা শুরু ও শেষ কুরবানির পথ। আর তারা কুরবানি এজন্য দিচ্ছে যে, যাতে এ দেশবাসীর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গোলামি থেকে মুক্তি লাভ করে ইজ্জত ও সম্মানের সাথে জীবনযাপন করতে পারে। যারা দেশের আযাদি আন্দোলনের বিরুদ্ধাচারণ করে থাকে, তারা আমাদের বন্ধু হতে পারে না। যারা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা ছড়িয়ে বেড়ায়, তারা আমাদের শত্রু। এমন ব্যক্তিদের প্রতি আমার অনুরোধ, আপনারা আমাদের নিয়ে মাথা ঘামানো ত্যাগ করুন, আমাদেরকে আমাদের কাজ করতে দিন।

আমার এই বক্তব্যে যদি কেউ মনে কষ্ট পেয়ে থাকেন, আমি তাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমার জীবন কাশ্মিরের আযাদির জন্য উৎসর্গিত। আমাকে এই পথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য কেউ চেষ্টা করবেন না। আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক পথের দিশা দিন এবং সত্য পথে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

[সমাপ্ত]
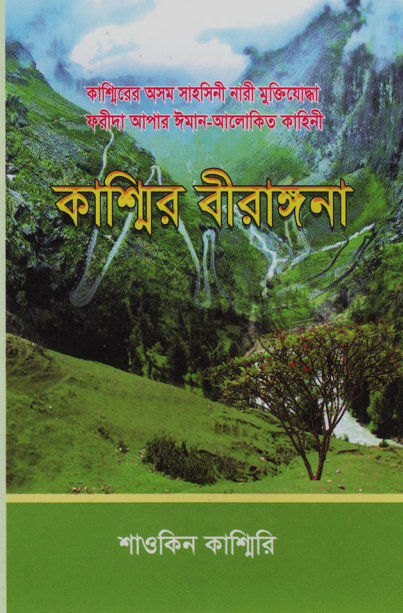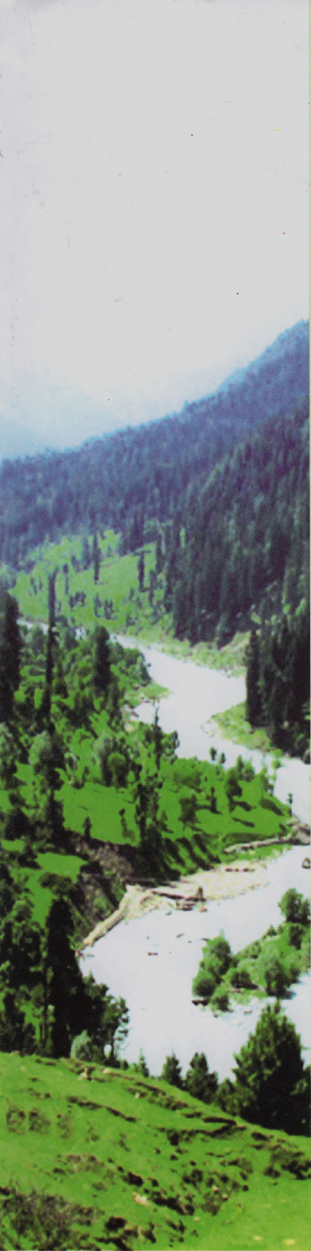
Rafee Graphics Design Mobile: 01914296066

আবাবীল পাবলিকেশন্স
১৩, কারকুন বাড়ী লেন, ঢাকা-১১০০